২০০১

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ১৪তম ও ১৫তম সংখ্যা

১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ ইসাব্দ

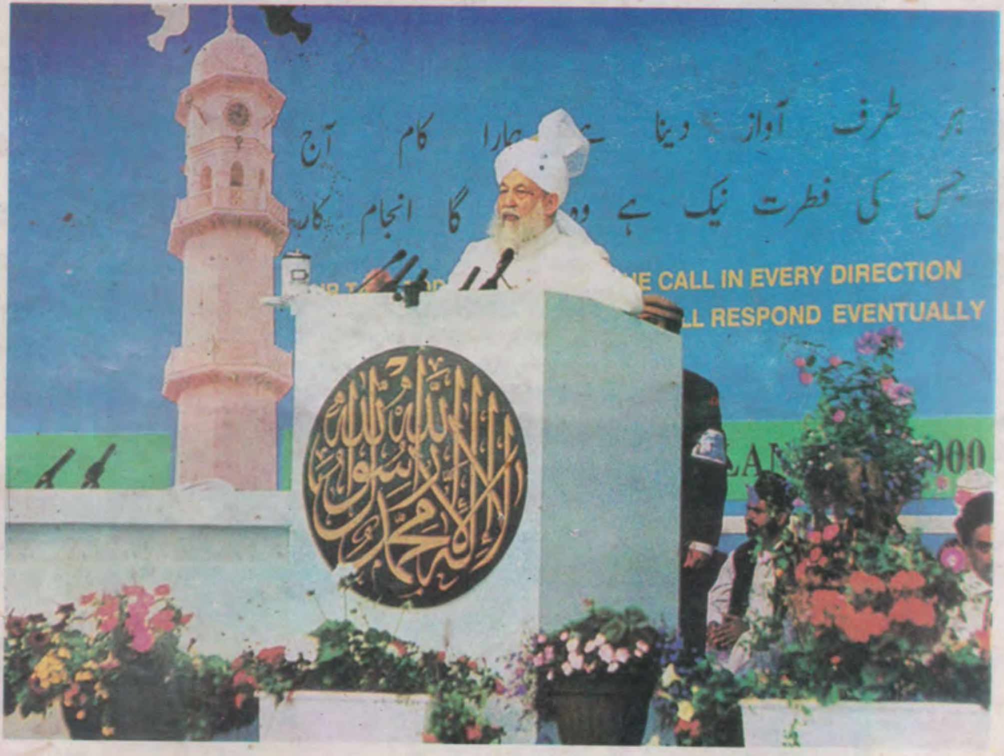

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৬তম সালানা জলসা-২০০০

নিজেদের ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় পোশাক পরিহিত বেনীন-এর দু'জন বাদশাহ্। এঁরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তবাররুক (কল্যান-মন্ডিত বস্ত্র) লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়ার মসজিদ প্রাঙ্গনে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, তারুয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জহির আহমদ মিয়াজী, মীর মোবাশ্বের আলী, মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্, এনামুল হক ভূঁইয়া ও পিছনে মোহাম্মদ শামসুল-হক কে দেখা যাচ্ছে

জলসার কল্যাণ

আল্লাহ্তাআলার বিশেষ আশিসে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৭৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৩য় সহস্রাব্দের প্রথম সালানা জলসা বিধায় আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আজ থেকে ১১০ বছর পূর্বে যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-ঐশী নির্দেশে এ জলসার প্রবর্তন করেন। এরই প্রতিচ্ছায়ারূপে প্রতি বছর সারা বিশ্বে বিভিন্ন জামাত জলসার আয়োজন করে থাকে। সুতরাং এ জলসার গুরুত্ব অপরিসীম এ জলসায় যারা সময় ও অর্থ ব্যয় করে যোগদান করবেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান, প্রকারান্তরে আল্লাহ্তাআলার মেহমান। যাতে আমরা মেহমানদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি সেজন্যে সকলের পূর্ণ সহযোগিতা ও দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। তদুপরি এ জলসা উপলক্ষে আগত মেহমানদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিম্নোক্ত দোয়ার প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন সকলে এ দোয়ার ভাগী হতে পারেন ঃ

"যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করেন, খোদা তাদের সহায় হউন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের ওপরে দয়াপরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ-কষ্ট হ'তে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ-কামনা ও কার্য-সিদ্ধির পথ তাদের জন্যে উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন। আর হাশরের দিনে তাদেরকে খোদা তাঁর সেই সব বান্দাদের সাথে উত্থিত করুন যাদের ওপরে তাঁর আশিস ও কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন। হে খোদা ! হে মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা ! এসবগুলো দোয়া-ই তুমি কবুল কর আর আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপরে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর। কেননা, সকল শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই, আমীন, সুম্মা আমীন (বিজ্ঞাপন ঃ ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯২)।

আল্লাহ্তাআলা যেন আমাদের সকলকে এ জলসার কল্যাণে ভূষিত করেন।

এ মাসেই বাংলার দামাল সন্তানেরা মাতৃ ভাষার সম্মান রক্ষার্থে নিজেদের মহামূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা বাংলাদেশে সেই সূর্য-সন্তানদের ত্যাগ ও আত্মবলিদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী
নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ১৪ ও ১৫তম সংখ্যা

৩ ফাল্গুন ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ২১ যিলকদ ১৪২১ হিঃ কাঃ
১৫ তবলীগ ১৩৮০ হিঃ শাঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০১ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	–	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ ঃ ফতোয়া

'ফতোয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে প্রদত্ত রায় বা অভিমত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই ইহা প্রদান করার যথাযোগ্য অধিকারী। ইহা ইসলামের একটি প্রশাসনিক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। বাজারে জাল টাকার কারণে কেউ যেমন আসল টাকাকে অস্বীকার করতে পারে না তেমনি অবৈধ ফতোয়াবাজীর প্রকোপে সঠিক ফতোয়াকে অস্বীকার করারও সুযোগ নেই। ইসলামের বিধি-বিধান পালনে কোন প্রকার নতুন সমস্যার উদ্ভাবন যেমন অনস্বীকার্য তেমনই ফতোয়ার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করারও অবকাশ নেই। নবী করীম (সঃ)-এর যুগে উম্মতের নিকট ধর্মীয় মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার উদ্ভব হ'লে কুরআনী বিধানের আলোকে তিনি (সঃ) ফতোয়া বা রায় দিয়ে এ সবের সমাধান দিতেন। নবী করীম (সঃ)-এর অন্তর্ধানের পরে এ কাজটি অর্পিত হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) ওপরে। কোন নতুন সমস্যার সমাধান তাঁরা দিতেন কুরআনী বিধান এবং নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র সুন্নতের আলোকে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে আসে রাজতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নতার যুগ। তখনও ফতোয়ার ব্যবস্থা প্রশাসনিকভাবে অব্যাহত ছিলো। ঐশী ব্যবস্থাপনায় এ কাজটি অর্পিত হয় যুগের ইমাম ও মুজাদ্দিদগণের ওপরে। কিন্তু যেহেতু এর পরে উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানা প্রকার অবৈধ ও ঐশী অননুমোদিত দলাদলী ও ফেরকাবন্দী, তখন এ ফতোয়া নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা প্রকার মতভেদ ও জটিলতা। ফতোয়ার বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় খেল-তামাশা। তথাকথিত মোল্লা-মৌলবী নিজস্ব ধ্যান-ধারণা মোতাবেক ফতোয়া প্রদান করা আরম্ভ করলে জাতির মধ্যে এ ফতোয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি খেলা-তামাশায় পরিণত হয়। কোন কোন পক্ষ থেকে-এর নামকরণ করা হয় 'ফতোয়াবাজী'।

মুসলিম যেহেতু শ্রেষ্ঠ উম্মত তাই এ উম্মত বিভ্রান্তি ও দলাদলীর মধ্যে চিরকাল অতিবাহিত করতে পারে না। তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যে নবী করীম (সঃ) বিভ্রান্তির যুগে-চরম বিপর্যয়ের কালে একজন 'হাকামান আদালান'বা ন্যায়-বিচারক-মীমাংসাকারী তথা ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শুভ সংবাদ দিয়ে গেছেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। তাঁর আগমনে উম্মতের মধ্যে সকল বিভ্রান্তি ও মতভেদের নিরসন ও অবসান হওয়ার কথা তথা তিনিই একমাত্র ফতোয়া দেবার ঐশী অথরিটি বা অধিকারী। এ 'হাকাম আদাল' হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর (আঃ) সত্তায় আজ থেকে ১১০ বছরের অধিক সময় পূর্বে ইসলামের মধ্যে আগমন করে জাতিকে বিভিন্ন মতভেদ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির পথে আলোকবর্তিকা জ্বেলে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির পথে বিচরণ করে উম্মতের অধিকাংশ মোল্লা-মৌলবী ও গদ্দীনশীন পীর-পুরোহিত আজ তাদের সে সুহৃদকে শত্রু ভেবে দূরে ঠেলে দিতে কার্পণ্য করে নি। অথচ আল্লাহ্র রসূলের (সঃ) তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি।

'ফতোয়া' নিয়ে আজ মুসলিম উম্মার মধ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশে যে মতভেদ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ ফতোয়ার অস্তিত্ব নিয়ে নয়, বরং ফতোয়া দেয়ার প্রকৃত অথরিটি নিয়ে। সমস্যা হলো, যে কেউ যে কোন বিষয় ফতোয়া দিতে কার্পণ্য করে না; তার অথরিটি থাকুক বা না থাকুক। আজ যে প্রেক্ষাপটে ও যে বিষয়টি নিয়ে এ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা-ও আল্লাহ্র বিধান কুরআন করীমের কদর্থ করার কারণে। ইসলামে তালাকের বিধান এত সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় যে, তথাকথিত 'হিলা' মসলার প্রশ্নই ওঠে না। রাগের মাথায় যেন-তেন করে তালাককে বৈধ করা হয় বিধায় হিলার মত জঘন্য কর্মকান্ডকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। 'হিলার' বিধানের অস্তিত্ব কুরআন, সুন্নত ও হাদীসে নেই এ কথা আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাও অনেকে স্বীকার করেন। এসব পরবর্তীকালে কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহলের নতুন সৃষ্টি। আমরা মাননীয় বিচারকের রায়ের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক একথা বলতে চাই যে, তালাকের মসলাকে যেভাবে কুরআন ও সুন্নতে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে কার্যকরী করলে জাতি এ সংকট ও জটিলতা থেকে যে মুক্তি পেতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'হিলা' নামক একটি জঘন্য প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়ার কোন প্রয়োজনই হয় না। এটা মোল্লা-মৌলবী কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি ঘৃণ্য, জঘন্য, অমানবিক ও মধ্যযুগীয় বর্বর পদ্ধতি। এতে বিশেষ করে নারীর অধিকার ও মান-সম্ভ্রমকে যথেচ্ছভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়। কুরআন হাদীসের প্রকৃত শিক্ষার সাথে এর দূরতম সম্পর্ক নেই।

প্রসঙ্গতঃ বলতে চাই, আহমদী মুসলিম জামাতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় খলীফা ফতোয়া দেবার ঐশী-প্রদত্ত অধিকারী। তিনি তাঁর অধীনস্থ 'দারুল ইফতা'-এর পরামর্শক্রমে কোন বিষয়ে ফতোয়া অনুমোদন করে থাকেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই সারা বিশ্বে বলবৎ হয়ে থাকে। আর এভাবেই সত্যিকারের ইসলামী বিধান সমুন্নত ও সংরক্ষিত হচ্ছে।

- নির্বাহী সম্পাদক

অনিবার্য কারণে ৩১শে জানুয়ারী ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী-২০০১ সংখ্যাদ্বয় বর্ধিত কলেবরে জলসা উপলক্ষ্যে যৌথ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা হলো।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল বাকারাহ্	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩-৪
❑ হাদীস ঃ পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ	৫
❑ অমৃত বাণী ঃ সালানা জলসায় আগমনের গুরুত্ব হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ	৫-৬
❑ জুমুআর খুতবা ঃ বেকারত্ব দূরীকরণ ও বিয়ে-শাদী হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৭
❑ জুমুআর খুতবা ঃ সবকিছু উৎসর্গের মাঝে বিজয় নিহিত হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৭-১২
❑ জুমুআর খুতবা ঃ জুমুআ, জুমুআতুল বিদা ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩-২১
❑ আহমদীয়া ফিকাহ্র পাতা থেকে ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিবাহ ও তালাক	ঃ সংকলন অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	২২-২৩
❑ কবিতা ঃ জাগো মুসলিম জাহান	ঃ মিসেস সাজেদা মতিন	২৩
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৪-২৫
❑ আমাদের চাঁদা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৬-২৮
❑ ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী	ঃ সংগ্রহ ও অনুবাদ- শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ	২৯
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩০-৩১
❑ আমি এক ফেরিওয়ালা	ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী	৩১-৩২
❑ ইসলামের বিজয় কোন পথে?	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	৩৩-৩৪
❑ কাদিয়ানের প্রতিচ্ছবি-সিদ্দীকিয়তের জামাত তারুয়া	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব (জয়)	৩৫-৩৬
❑ কেন্দ্রীয় সালানা জলসার ইতিবৃত্ত	ঃ জনাব মোঃ কওসার আলী মোল্লা	৩৭
❑ হোমিওপ্যাথি ঃ সদৃশ বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৩৮-৩৯
❑ প্রশ্ন ও উত্তর	ঃ নির্বাহী সম্পাদক	৪০-৪১
❑ আপনার পত্র পেলাম	ঃ [illegible] আউয়াল	৪২-৪৩
❑ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিগত বছরের নির্বাচিত ঘটনাক্রম	ঃ সংকলন - জনাব আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	৪৪-৪৬
❑ নতুন সহস্রাব্দে আহমদীয়ত	ঃ জনাব শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন	৪৬-৪৮
❑ মূল ধারা ঃ ফতোয়াবাজী নিষিদ্ধ ঘোষণা	ঃ জনাব নেসার আহমদ	৪৮-৫০
❑ যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় আগমন	ঃ গ্রন্থনা - আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ	৫১-৫২
❑ সংবাদ	ঃ	৫৩-৫৫

প্রচ্ছদ ঃ ওপরে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা-২০০০ এবং নিচে তারুয়া জামাতের সালানা জলসা-২০০১

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৭৭তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে কাদিয়ানের নাযেরে 'আলা হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের বাণী

তিনি জলসায় আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের বিভিন্ন দোয়া উদ্ধৃত করে জলসায় যোগদানকারীদের জন্যে সালাম ও দোয়ার তোহ্ফা পাঠিয়েছেন ফ্যাক্স মারফত। তিনি জলসার সার্বিক সফলতা কামনা করে দোয়া করেছেন। এ মহতী জলসায় অনিবার্য কারণে যোগদান করতে না পারায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

সমবেদনা

সম্প্রতি ভারতের গুজরাটে ভয়াবহ ভূমিকম্পে অগণিত মানব-সন্তান নিহত হয়েছেন ও প্রভূত ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে এতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূরাতুল বাকারা-২

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৮। এবং যদি তারা তালাক[২৭৬] দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ وَ
لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ
اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٩﴾

২২৯। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল[২৭৭] পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে, এবং যদি তারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহলে (তারা জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ হবে না, এবং তাদের স্বামীগণ এর (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার সমধিক হকদার হবে, যদি তারা আপোস-মীমাংসা[২৭৮] করতে চায়। এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে যত অধিকার নারীদের উপর পুরুষদের আছে তদনুরূপ অধিকার (পুরুষদের উপর) নারীদের আছে; কিন্তু নারীদের পুরুষদের (এক প্রকার) প্রাধান্য[২৭৯] আছে। এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। ২৮ রুকূ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ
اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

২৩০। (এইরূপ) তালাক দু'বার (ঘোষিত হতে পারে), অত:পর হয় (স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে রাখতে হবে নয়তো সদয়ভাবে বিদায়[২৮০] দিতে হবে। এবং তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু (ফেরৎ) গ্রহণ করা বৈধ হবে না যা তোমরা তাদেরকে দিয়েছ,[২৮১] কেবল সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন তারা উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না। অত:পর তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা(স্বামী ও স্ত্রী) দু'জনই আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী মুক্তিলাভের বিনিময়ে ২৮২ যা কিছু (পুরুষের পক্ষে) ছেড়ে দেয় তাতে উভয়েরই কোন পাপ হবে না। এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, সুতরাং তোমরা তা লংঘন করো না; এবং যারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করে তারাই অপরাধী।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ
اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣١﴾

২৩১। অত:পর, যদি সে স্ত্রীকে (উক্ত দুই তালাকের সময় অতিক্রম হওয়ার পরও তৃতীয়) তালাক[২৮৩] দেয় তা হলে ঐ স্ত্রী অত:পর তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপর স্বামীকে বিবাহ করে, এবং এরপর সে-ও যদি তাকে তালাক দেয়, তা হলে তাদের দু'জনের পরস্পরের প্রতি প্রত্যাবর্তন করায় কোন পাপ হবে না, যদি তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমাসমূহ রক্ষা করতে পারবে। এগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, যা তিনি জ্ঞানী লোকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ
وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣٢﴾

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌছে,[২৮৩-ক] তখন তোমরা তাদেরকে হয় ন্যায়সংগতভাবে[২৮৪] রাখ, নয়তো ন্যায়সংগতভাবে তাদেরকে বিদায় দাও; এবং তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আটকে রেখো না, যাতে তোমরা (তাদের উপর) অত্যাচার করতে পার। এবং এরূপ করে সে নিজের আত্মার উপরই যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্র আদেশসমূহকে উপহাসের বস্তু বানিও না; এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাকেও যা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব এবং প্রজ্ঞা-যদ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন। এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ২৯ রুকূ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ
اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ
ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٣﴾

২৩৩। এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌছে তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীদের[২৮৫] সাথে বিবাহ করতে বাধা দিও না যদি তারা ন্যায়সংগতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। এর দ্বারা তোমাদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্র উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে। ইহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র; এবং আল্লাহ্ জানেন কিন্তু তোমরা জান না।

২৭৬। এই আয়াত দ্বারা আরম্ভ হয়েছে তালাক-বিষয়ক ইসলামী আইন। এই আইন অনুযায়ী, ন্যায়-সঙ্গত কারণে, স্বামী তার স্ত্রীকে 'তালাক' দিবার অধিকার প্রাপ্ত হ'ল। তবে এই অধিকার কদাচিৎ, কেবল মাত্র অতি অপরিহার্য অবস্থায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২৭৭। 'কুরূ' কুর বা কার' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ একটি সময়-সীমা ; ঋতুস্রাবকাল সময়ের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সুস্থাবস্থা ; ঋতুস্রাবের অবসান ; ঋতুস্রাব ও সুস্থাবস্থার যুগ্ম সময় অর্থাৎ পূর্ণ একমাস ; যে সময়ে সুস্থাবস্থা থেকে স্ত্রীলোকেরা ঋতস্রাবের অবস্থায় প্রবেশ করে (মুহীত ও মুফরাদাত)। নবী করীম (সঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূবকর ও হযরত উমর (রাঃ) এবং ইসলামী আইনবিদ ইমামগণের মধ্যে হযরত আবূ হানিফা ও হযরত আহমদ বিন হাম্বল 'কুর' বলতে ঋতুস্রাবের সময়টিকে বুঝতেন। অন্যদিকে হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর (রাঃ), ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী

ঋতুস্রাব-কাল বাদ দিয়ে সুস্থাবস্থার সময়টাকে 'কুর' মনে করতেন। উভয়দিকে সম-ওজনের অভিমত থাকায়, মুসলমানের পক্ষে যেকোন অভিমত গ্রহণযোগ্য তবে সব কিছু মিলিয়ে যুক্তি-তর্কগুলিকে একত্র করে দেখলে (সেগুলি উপস্থাপন এখানে নিষ্প্রয়োজন), এই উপসংহারে পৌঁছা যায় যে, প্রথমোক্ত অভিমতই অধিকতর যুক্তি-গ্রাহ্য। তবে যদি কেউ নিরাপদ সীমানায় থাকতে পসন্দ করেন, তার পক্ষে উভয় অভিমতকে সম্মান দিয়ে 'কুর' এর অর্থ-'সম্পূর্ণ মাস'ই ধরা ভাল।

২৭৮। সকল আইন-সঙ্গত বিষয়ের মধ্যে, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হলো 'তালাক' (দাউদ)। তাই এর চারিদিকে বেড়া দিয়ে, বাধা দিয়ে, সীমা দিয়ে, রাখা হয়েছে। যেমন (ক) ঋতুমুক্ত হওয়ার পরে, যদি স্বামী ঐ পরিশুদ্ধ অবস্থার সময়ে স্ত্রী-গমন করে না থাকে, তা হলে কেবলমাত্র সেই সুস্থ অবস্থাতেই একটি তালাক দিতে পারে, (খ) তালাক দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর, স্ত্রী তিনটি ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (প্রায় তিনমাস কাল)। এই সময়টি 'ইদ্দৎ' বা অপেক্ষার সময় বলা হয়। এইভাবে, স্বামীকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়, যাতে সে তার কাজের সকল দিক পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করতে পারে এবং তার মনের মধ্যে যদি ঐ স্ত্রী সম্বন্ধে ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ কিছু থাকে, তবে সেটা যেন জ্বলে ওঠে ও নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে, (গ) স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তা হলে স্বামীর কাছে তা লুকোবে না। কেননা, সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হবার কথা, সেই সময়ে দম্পতির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, (ঘ) পূর্ণ ও অখন্ডীয় (বাইন) তালাকের জন্য তিন দফায় তিন মাসে প্রত্যেক ঋতুস্রাবের পর তালাক ঘোষণা প্রয়োজন। প্রথম দফার এবং দ্বিতীয় দফার তালাক ঘোষণার পরেও ইচ্ছা করলে স্বামী স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার অধিকার ও সুযোগ পায়। এমনটি তালাকের পরবর্তী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও, তৃতীয় দফায় তালাক ঘোষণার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে নূতনভাবে বিয়ে করে মিলিত হতে পারে।

২৭৯। ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার সমান সমান। তবুও, ৪ ঃ ৩৫ অনুযায়ী, পুরুষের শারীরিক সুযোগ-সুবিধা বেশী এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ও পারিবারিক খরচ-পত্রের বোঝা বহনের দরুন, পরিবারে স্বামীর কিছুটা প্রাধান্য থাকে।

২৮০। এই আয়াতে তালাকের (বিবাহ-বিচ্ছেদ) পঞ্চম বাধাটি বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চায়, তাকে তিনবার পৃথক পৃথকভাবে তিন মাসে তালাকের ঘোষণা দিতে হবে। প্রত্যেকটি তালাকের ঘোষণা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, স্ত্রীর তিনটি ঋতু-মুক্তির সময়ে সহবাস না করা অবস্থায় উচ্চারিত হতে হবে। একই সময়ে পরপর তিনবার বা দুইবার 'তালাক' উচ্চারণ অনুমোদনযোগ্য নয়। "মাররাতান" (দু'বার) শব্দ দ্বারা এটাই বুঝায় যে, দু'টি ভিন্ন সময়ে ইহা ঘটতে হবে ; একই সময়ে দু'বার ঘটতে পারে না। হযরত রসূলে করীম (সঃ) একই সময়ে বহুবার 'তালাক' উচ্চারণকে, 'এক তালাক' গণ্য করতেন (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)। নিসাই থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আঁ হযরত (সঃ)-কে বলা হলো যে, এক ব্যক্তি একই নিঃশ্বাসে তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ করেছে। তিনি এতে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, "কী! আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতেই তোমরা আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে খেলার বস্তু বানাবে ?" প্রথম দু'বারের তালাকের ক্ষেত্রে, ইদ্দতের (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে, স্ত্রীর সম্মতি-অসম্মতি ছাড়াই পুনঃ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, কেবল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে পুনর্বিবাহের মাধ্যমে তাকে পুনঃ গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তৃতীয় বার তালাক ঘোষণার পর, স্বামীর আর কোন সুযোগ বা অধিকার থাকে না এবং পুরোপুরি বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এক সাহাবী একদিন রসূল করীম (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কুরআনতো মাত্র দু'টি তালাকের উল্লেখ করেছে, তৃতীয়টি কোথা থেকে এলো ? উত্তরে রসূল করীম (সঃ) এই আয়াতে "অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হবে" বাক্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এর তাৎপর্য এই যে, প্রথম দু'বার তালাকের পরও স্বামী স্ত্রীকে রাখতে পারতো কিংবা সম্মতি নিয়ে তাকে পুনর্বিবাহ করতে পারতো। কিন্তু সে যদি স্থায়ী বিচ্ছেদ ও অখন্ডনীয় তালাকই চায়, তা হলে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধন থেকে পুরাপুরি মুক্তি দিতে হবে। এই কথাই 'সদয়ভাবে বিদায় দিত হবে' বাক্যটিতে বলা হয়েছে, যার অর্থ হলো তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করে মুক্তি দাও (জরীর ও মুসনাদ)। পরবর্তী আয়াতে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অতএব, এখানে "তসরীহ্‌" শব্দের দ্বারা 'তালাক' বুঝিয়েছে।

২৮১। যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন সে তার প্রদত্ত মহরানা ও অন্যান্য বস্তু যা স্ত্রীকে দিয়েছিল, তা সবকিছু থেকে সে বঞ্চিত হয়। তালাক দানের পূর্ব পর্যন্ত সে যদি মহরানা অর্থ পরিশোধ করে না থাকে, তা হলে 'তালাক' কার্যকরী করার পূর্বেই তা পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া দাম্পত্য জীবনে যা কিছু সে দান করেছে, তা ফেরৎ নেয়ার অধিকার তার থাকে না।

২৮২। তবে, যে ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজেই স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হতে চায়, যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয়, সেক্ষেত্রে স্ত্রী তা 'কাযী' বা বিচারকের মাধ্যমে লাভ করতে পারে। "উভয়ে আশঙ্কা করে" কথা দ্বারা ন্যায়-অন্যায়ের আশঙ্কা বুঝায় এবং এক্ষেত্রে কাযীর মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে তার মহরানার টাকা ও স্বামীর প্রদত্ত অন্যান্য জিনিসপত্র ছেড়ে দিতে হয়, সমঝোতার মাধ্যমেই হোক অথবা কাযীর ফয়সালার মাধ্যমেই হোক। কায়েস বিন সাবিতের স্ত্রী জামিলার বিবাহ-বিচ্ছেদ 'খোলা' এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামী কায়েসের উগ্র স্বভাবের কারণে জামিলা, 'খোলা'-এর আবেদন জানালেন। তিনি বললেন যে, স্বামীর সাথে তার বনিবনা হচ্ছে না, কারণ উভয়ের মন-মেযাজে এতই পার্থক্য যে সমঝোতা বিধান সম্ভব নয়। মহানবী (সঃ) তার 'খোলা'-এর আবেদন মঞ্জুর করলেন, তবে তার স্বামী প্রদত্ত বাগানটি স্বামীকে ফেরৎ দিতে হলো (বুখারী)।

২৮৩। এই আয়াতে, তৃতীয় এবং শেষবারের 'তালাক'-এর কথা বলা হয়েছে। এর পর মুহূর্ত থেকে স্ত্রীর সাথে পুনর্মিলনের আর কোন অধিকার থাকলো না। তবে যদি এমনটি ঘটে যে, তার পরিত্যক্তা স্ত্রী অন্য কাকেও যথাবিধি বিয়ে করলো এবং ঐ স্বামীও তাকে স্বাভাবিক ঘটনাক্রমে তালাক দিল কিংবা মারা গেল, তখন পূর্ববর্তী স্বামী, তার (স্ত্রীর) মত নিয়ে, তাকে বিবাহ করতে পারে। ইসলামে, তালাকের আইনে এই ধারাটি সন্নিবিষ্ট থাকায় একদিকে যেমন বিবাহের গুরুত্ব, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন হয়, তেমনি অন্যদিকে একটি দূরতম সুযোগও রাখা হলো, যাতে সেই দম্পতি যারা এক সময় একত্রে বাস করেছে, তারা ইচ্ছা করলে পরবর্তীকালে পুনরায় একত্রিত হ'তে পারে।

২৮৩-ক। 'বালাগাল আজালা' অর্থ তার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে এলো বা নির্ধারিত সময় পূর্ণ করলো। বিজ্ঞ পন্ডিতেরা সকলেই একমত যে, এখানে প্রথমোক্ত অর্থটিই প্রযোজ্য (কুরতুবী)।

২৮৪। প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, এখানে যে তালাকের কথা বলা হয়েছে, তা প্রত্যাহার-যোগ্য তালাক। প্রত্যাহার-যোগ্য তালাক ঘোষণার পর দু'টি পথ খোলা থাকে ঃ (১) স্বামী তার স্ত্রীকে রেখে দিতে পারে, তবে স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ও উদার ব্যবহার করতে হবে, (২) স্বামী তাকে (স্ত্রীকে) নিজের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও সে উদারতা ও শালীনতার সঙ্গে তাকে বিদায় দিবে। উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর দুর্ব্যাহার নিষিদ্ধ। তদুপরি, স্ত্রীকে ঝুলন্ত ও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখাও নিষিদ্ধ।

২৮৫। এই আয়াতে "স্বামীদেরকে" বলতে তালাক-প্রাপ্ত স্ত্রীগণের আপন আপন প্রাক্তন স্বামীকে অথবা ভাবী-স্বামীকে বুঝাতে পারে। প্রাক্তন-স্বামী বুঝালে, "এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও" বাক্যাংশটি প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি ভাবী-স্বামী বুঝায় তা হলে উক্ত বাক্যাংশটি তৃতীয় ও শেষ 'তালাক' নির্দেশ করে। তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের অভিভাবক, পূর্ব-স্বামীর সাথে (পূর্বোক্ত বিধি মোতাবেক) তার পুনর্বিবাহে বাধা দিতে পারে না এবং তার ভূতপূর্ব স্বামী তাকে নূতন স্বামী গ্রহণেও বাধা দিতে পারে না।

হাদীস শরীফ

পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ

কুরআন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۹﴾

অনুবাদ ঃ "আর তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাদের সাথে (সংযুক্ত) রাখ যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে তাঁর সন্তোষ লাভের আশায় সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে, এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার চক্ষুদ্বয় যেন তাদেরকে পিছনে ফেলে আগে বেড়ে না যায়, এবং তুমি তাদের আনুগত্য কোর না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছে আর সে হীন বাসনার অনুসরণ করেছে ও যার বিষয় সীমা ছাড়িয়ে গেছে" (সূরা কাহাফ ঃ ২৯)।

হাদীস ঃ

আন আবি হুরায়রাতা আনিন নাবীয়্যে (সঃ) আন্না রাজুলান যারা আখান্ লাহু ফী কারইয়াতীন উখরা, ফাআরসাদাল্লাহুতাআলা আলা মাদরাযাতেহী মালাকান ফালাম্মা আতা আলায়হে ক্বালা আয়না তুরীদু ক্বালা উরীদু আখান্লী ফী হাযিহীল ক্বারইয়াতি ক্বালা হাল লাকা আলায়হে মিন নি'মাতিন তারুব্বুহা আলায়হে ক্বালা লা গায়রা আন্নি আহ্বাবতুহু ফীল্লাহি ক্বালা ফাইন্নি রসূলুল্লাহি ইলায়কা বি আন্নাল্লাহা ক্বাদ আহাব্বাকা ক্বামা আহবাব্তাহু ফীহি" (মুসলিম)।

অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি অন্য শহরে বসবাসরত এক ভাইকে দেখতে গেল। আল্লাহ্তাআলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফিরিশ্তা নির্দিষ্ট করে দিলেন। যখন সে এ রাস্তায় আসলো, ফিরিশ্তা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন ? লোকটি বললো, এ শহরে আমার এক ভাই থাকে, তাকে দেখার জন্য এসেছি। ফিরিশ্তা বললো, তার কাছে আপনার কি কোন আকর্ষণীয় প্রাপ্য আছে যার জন্য আপনি যেতে চেষ্টা করছেন ? সে বললো, আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমি তাকে ভালোবাসি, অন্য কোন স্বার্থ নেই। ফিরিশ্তা বললো, আমি আল্লাহ্র দূতরূপে আপনার কাছে এসেছি এটুকু জানানোর জন্য যে, আপনি যেমন ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, আল্লাহ্ও তদ্রূপ আপনাকে ভালোবাসেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআনের আয়াতটিতে আল্লাহ্তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন, আমরা যেন ঐ সকল লোকের সাথে থাকি যারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্কে ডাকে এবং আমরা যেন তাদের ত্যাগ করে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করি। বস্তুত এখানে এমন দলের সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র ইবাদতে তাঁর কাজে নিয়োজিত থাকে।

হাদীস শরীফে ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে অর্থাৎ যে খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আপন ভাই হোক বা ধর্মীয় ভাই যদি দেখা সাক্ষাৎ করে তবে তার জন্য উপরোক্ত সুসংবাদ রয়েছে।

জলসা সালানা ভাতৃত্বের এমনই এক মিলনস্থল যেখানে খোদা ও তাঁর রসূলের কথা শুনার জন্য দেশের আনাচে-কানাচে হতে দীনি ভাইগণ একত্রিত হয়ে থাকেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য যদি খোদা ও খোদার রসূলের সন্তুষ্টি হয়ে থাকে তবে তারা অবশ্যই উপরোক্ত সুসংবাদের অধিকারী। সালানা জলসায় আগমনের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উপরোক্ত বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন, যেন একে অপরের সাথে মিলিত হই ও নতুন ভাইদের সাথে পরিচিত হই। এই মিলনস্থলটি এমন যেখানে আল্লাহ্র গুণগানে সকাল-সন্ধ্যায় অংশগ্রহণকারীদের মাথা বিনত হয় ও হৃদয় তাঁর যিক্রে আলোকিত হয়ে থাকে।

অতএব আমরা যারা জলসাতে অংশগ্রহণ করি আমাদের এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যেন কুরআন ও হাদীসের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের জলসাকে সাফল্যমন্ডিত করি ও আশীষের ভাগীদার হই। এ সময়টাকে যেন খোদাও খোদার রসূলের কথা স্মরণ করে হাম্দ ও না'ত করে ও ইস্তিগফার করে অতিবাহিত করি, আমীন।

অনুবাদ ও **ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

সালানা জলসায় আগমনের গুরুত্ব

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

বিজ্ঞপ্তি

(এক) "অধমের নিকট বয়াতপূর্বক ও জামাতে প্রবেশকারী সকল নিষ্ঠাবান ব্যক্তির জেনে রাখা দরকার যে, বয়াত করার উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ যেন নিবারিত হয় আর স্বীয় মহান প্রভু এবং রসূলে মকবুল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভালবাসা প্রাণে সমুন্নত থাকে। আর সংসার বর্জনের অবস্থা এরূপ হয়ে যায় যদ্দারা আখেরাতের সফর যেন দুর্বিষহ মনে না হয়; কিন্তু এ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে পুণ্য সংস্পর্শে থাকা ও জীবনের এক অংশ এ পথে ব্যয় করা আবশ্যক। যদি খোদাতাআলা চান, তাহলে কোন নিশ্চিত দলীল প্রত্যক্ষ করার ফলে যেন শক্তিহীনতা ও দুর্বলতা ও আলস্য দূরীভূত হয় এবং দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবার পরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে সর্বদা চিন্তায় থাকা উচিত এবং এমনভাবে চিন্তা করা উচিত যেন খোদাতাআলা এর সৌভাগ্য দান করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর সৌভাগ্য না হয়, কখনও কখনও অবশ্যই সাক্ষাৎ লাভ হওয়া উচিত। কেননা, বয়াত গ্রহণের পর সাক্ষাৎ লাভের কোন পরওয়া না করা এমনই এক বয়াত গ্রহণ যাতে কোনই কল্যাণ নেই এবং ইহা নিছক আনুষ্ঠানিক বয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু প্রত্যেকের জন্যে মনের দুর্বলতা বা অক্ষমতা বা সফরের দূরত্বের কারণে এরূপ সুযোগ হতে পারে না যে, সে আমার সংস্পর্শে এসে থাকে বা বৎসরে কয়েক বার কষ্ট করে সাক্ষাতের জন্যে এখানে আসে। কেননা, অধিকাংশ হৃদয়ে এখনও ততটা উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত হয় নি যে, সাক্ষাতের জন্যে বড় বড় দুঃখ ও বড় বড় বাধা-বিপত্তিকে সহ্য করতে পারে।

এ কারণে অবস্থাদৃষ্টে উপলব্ধি করা যায় যে,

বছরে এরূপ ৩ দিন ব্যাপী জলসার আয়োজন করা হোক যার মধ্যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ, যদি আল্লাহ্ চাহেন, সুস্থ থাকেন, অবকাশ পান, এবং কঠিন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে যেন তারা নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হয়ে যান।

সুতরাং আমার মতে উত্তম ইহাই যে, ঐ তারিখ যেন ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ আজকের পরে যা কিনা ৩০শে ডিসেম্বর ১৮৯১ এর পরে আগামীতে আমাদের জীবনে ২৮শে ডিসেম্বর তারিখ যখন আসে তখন যতটুকু সম্ভব সকল বন্ধুকে কেবল রব্বানী কথাবার্তা শুনার জন্যে, দোয়ায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে ঐ তারিখে এখানে এসে যাওয়া উচিত। আর এ জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্ব-জ্ঞানে ভরপুর কথাবার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকবে, যা ঈমান, প্রতীতি ও তত্ত্ব-জ্ঞানে বুৎপত্তি দানের জন্যে আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্যে বিশেষ দোয়া, এবং বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে যেন খোদাতাআলা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। আর এসব জলসায় একটি সাময়িক কল্যাণ তাদের ইহাও লাভ হবে যে, **প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে দাখেল হবেন তারা ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন এবং পরিচিত হয়ে পরস্পরে আত্মীয়তার বন্ধন ও পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এ জলসায় তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা হবে।** আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার জন্যে এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ কাঠিন্য, অপরিচিতি ও কপটতা দূরীভূত করার জন্যে মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে যা ইনশাআল্লাহুলকৃদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে। কম আয়ের লোকদের জন্যে উচিত হবে যেন তারা পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্যে প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক রেখে দেন তাহলে সময় মত পথ খরচের টাকা সংকুলান হয়ে যাবে। মোটকথা এ পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। উত্তম ইহাই হবে যে, যেসব বন্ধু এ প্রস্তাবে রাজী হবেন তারা লিখিতভাবে বিশেষ করে আমাকে জানাবেন যেন আলাদা তালিকায় তাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে সংরক্ষিত থাকে। তারা শক্তি ও সামর্থ্যে যতটুকু কুলোয় নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হওয়ার জন্যে নিজের ভবিষ্যত জীবনের জন্যে যেন অঙ্গীকার করে নেয় এবং জীবনের বিনিময়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় কেবল ব্যতিক্রম হবে যে, এমন প্রতিবন্ধকতা এসে যায় যাতে সফর করা সাধ্যের বাইরে চলে যায়। আর এখন ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ধর্মীয় পরামর্শের জন্যে জলসা করা হয়েছে। এ জলসায় যেসব বন্ধু কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে সফরের কষ্ট বরদাশ্‌ত করে এসেছেন খোদা তাদের উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌তাআলা পুণ্য দান করুন, আমীন সুম্মা আমীন"।

জলসা সালানায় অনুপস্থিত বন্ধুগণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ

(দুই) "বহু লোক আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত নয় যে, আমরা তাদেরকে কোন পর্যায়ের মানুষ গড়ার প্রত্যাশা করি? যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে খোদাতাআলা আমাদেরকে আবির্ভূত করেছেন উহা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা বারংবার এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানের জলসায়) না আসে এবং আসার জন্যে মোটেও যেন বিরক্তি বোধ না করে।

যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করে যে, (জলসায়) আসতে তার ওপরে বোঝা পড়ে বা এরূপ মনে করে যে, এখানে অবস্থানকালে আমাদের ওপরে বোঝা চাপে, তার ভয় করা উচিত যে, সে শিরকে নিপতিত। আমাদের বিশ্বাস তো এই যে, যদি সমগ্র জগৎ আমাদের পরিবার হয়ে যায় তাহলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ সুসম্পন্ন করার জন্যে আমাদের খোদাতাআলা আমাদের অভিভাবক। আমাদের ওপরে কোন বোঝা নেই।

আমাদের বন্ধুদের দেখলেই বড় আনন্দ লাগে। আমি কতককে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমরা এখানে বসে কেন হযরত সাহেবকে কষ্ট দেবো। আমরা তো নিষ্কর্মা। এখানে বসে কেন অন্ন ধ্বংস করবো। ইহা ধোঁকা। ইহা অন্তর থেকে দূরে নিক্ষেপ করা উচিত। তারা ইহা মনে রাখুন যে, ইহা শয়তানী কুমন্ত্রণা যা কিনা শয়তান তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে যেন তারা এখানে স্থায়ীভাবে না থাকে" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, ৪৫৫ পৃঃ)।

এই জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে প্রধান লক্ষ্য হলো, **প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি যেন ধর্মীয় কল্যাণ লাভের প্রত্যক্ষ সুযোগ লাভ করেন। এবং তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞান যেন বিস্তৃতি লাভ করে।** এবং আল্লাহ্‌তাআলার ফযল এবং অনুগ্রহে তাদের তত্ত্ব-জ্ঞান যেন উন্নতি লাভ করে। এবং এর মাঝে এই কল্যাণও নিহিত যে, এই সাক্ষাৎ লাভের কারণে উপস্থিত ভাইদের পরস্পর পরিচিতির পরিধি ব্যাপকতর হবে। আর এই জামাতের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হবে। এছাড়া এই জলসায় অত্যাবশ্যকীয় উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে এটাও একটি যে, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতি ধর্মীয় সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যে এতে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাবলীও উপস্থাপন করা হবে। কেননা এটি এখন স্বতঃসিদ্ধ একটি বিষয় যে, ইউরোপ এবং আমেরিকার সচ্চেতা মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আরও বলেছেন সুতরাং বহুবিধ কল্যাণ নিহিত এই জলসায় যাতায়াত খরচ বহনে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির আসা আবশ্যক। এবং নিজের শীতকালীন বিছানা-পত্র যেমন লেপ ইত্যাদিও প্রয়োজন অনুযায়ী যেন সাথে নিয়ে আসেন। এবং তিনি যেন আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর পথে ছোটখাটো বাধা-বিপত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেন। খোদাতাআলা নিষ্ঠাবান বান্দাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পুণ্য দান করে থাকেন। এবং তাঁর পথে কোন পরিশ্রম বা কষ্ট স্বীকার বিফলে যায় না। এবং পুনরায় লেখা হচ্ছে, এই জলসাকে সাধারণ জাগতিক কোন সভা সম্মেলনের মত মনে করবেন না। এটা সেই বিষয় যায় ভিত্তি সত্যের ঐকান্তিক সমর্থন ও ইসলামের বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারাবাহিক কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং মহান আল্লাহ্ কর্তৃক স্বহস্তে স্থাপিত। এবং এর জন্যে তিনি এমন জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন যাঁরা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবেন। কেননা, এটা সর্বশক্তিমান খোদার কাজ যাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

পরিশেষে আমি এই দোয়ার সাথে শেষ করছি। প্রত্যেক সে ব্যক্তি যিনি এই ঐশী জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বন করেন। খোদাতাআলা তাদের সাথী হোন। এবং তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। এবং তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। আর তাঁদের সমস্যাবলী ও উদ্বিগ্ন অবস্থা তাঁদের জন্যে সহজসাধ্য করে দিন। আর তাঁদের দুঃশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা মোচন করে দিন। এবং তাঁদেরকে প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার পথ তাঁদের জন্যে উন্মুক্ত করুন। এবং পরকালে তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়াপ্রাপ্ত বান্দাদের সাথে উত্থিত করুন। এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাঁদের অবর্তমানে যেন তিনি তাঁদের স্থলাভিসিক্ত থাকেন।

হে খোদা, হে মহামর্যাদাবান, স্বতঃপ্রবৃত্ত-অনন্তদাতা, বার বার কৃপাকারী ও দুঃখমোচনকারী খোদা; আমার এই সব দোয়া কবুল কর। এবং আমাদেরকে আমাদের বিরোধীদের উপর উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে বিজয় দান কর। কেননা সব শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই। আমীন-সুম্মা আমীন। [মজমুয়া ইশতেহারাত - ১ম খন্ড ৩৪০-৩৪২ পৃষ্ঠা]।

বেকারত্ব দূরীকরণ এবং বিয়ে-শাদী

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৫ ডিসেম্বর, ২০০০ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর বলেন ঃ আজকের খুতবার জন্য কোন নোট প্রস্তুত করে আনি নি। বেশী সময় দাঁড়াতে গেলে আমার পায়ে দুর্বলতা বোধ হয় অথচ চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় না। আজ আপনাদেরকে একটি স্বপ্নের বিবরণ শোনাব যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। আজকের খুতবার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে।

আমার মনে চিন্তা ছিল যে, আমার ব্যস্ততাকে বাড়ানোর প্রয়োজন। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে মির্যা গোলাম আহমদকে দেখলাম। মির্যা গোলাম আহমদ যিনি খুরশীদ আহমদের ছোট ভাই। [মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সর্ব প্রথম পুত্র হযরত মির্যা সুলতান আহমদ মরহুমের ছেলে হযরত মির্যা আযীয আহমদ (রঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান – অনুবাদক] আমি যখন তফসীরে সগীর-এর উপর পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছিলাম তখন মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আমাকে সম্পূর্ণ নতুন অনুবাদ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নতুন অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। স্বপ্নে দেখলাম মির্যা গোলাম আহমদ আমাকে বলেছেন, "দু'টি বড় কাজে আপনার সাহায্য আমাদের বড় প্রয়োজন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কাজ দু'টি কী কী? তিনি বললেন, (১) প্রথমত; রিশ্‌তানাতা যেদিকে ইতঃপূর্বে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া হয় নি। অনেক বিবাহযোগ্যা কন্যা অবিবাহিতা বসে আছে। অপর দিকে অনেক বিবাহযোগ্য

যুবক পসন্দমত মেয়ে পাচ্ছে না। পাকিস্তানে অনেক নিরহংকার ভাল ছেলে আছে যারা ভাল ভাল পেশার সুযোগ পেলে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবে। যদি ইংল্যান্ডের আমাদের মেয়েরা (পাকিস্তানী এসব যুবকের সাথে) বিয়ের প্রস্তাবে নাক না সিট্‌কায় তবে উভয় পক্ষের জন্য মঙ্গল হতে পারে। দ্বিতীয় সমস্যা বেকারত্বের সমস্যা। বেকার যুবকদের কোন না কোন কাজে নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ দিকেও খুব কম দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। অনেক শিক্ষিত যুবক বেকার বসে আছে। কাজ পাচ্ছে না। অথবা তারা এমন দেশে বসবাস করে যেখানে ধর্মীয় কারণে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এমন যুবকদের যদি বিদেশে বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় তবে এতে করে উভয় সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। বাইরের দেশে যারা রয়েছে এবং পাকিস্তানে আমাদের যারা বেকার উভয় পক্ষের সমস্যার সমাধান হতে পারে।"

হুযূর (আইঃ) বলেন, বিষয় দু'টো এমন যে, আল্লাহ্‌তাআলা আমার প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। এটি আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ইংল্যান্ডের আমীর সাহেবের পরামর্শ নিব যিনি এ সমস্ত কাজে খুবই অগ্রগামী এবং অনেক বড় সেবার কাজে নিয়োজিত আছেন। অন্যান্য যারা অভিজ্ঞ, উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ আছেন তাদের মতামত নিয়ে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে যারা উপর আমার নির্দেশে কাজ হবে। এ বিষয়ে শীঘ্রই পরিকল্পনা প্রস্তুত করে জামাতের সামনে রাখা হবে" (দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়াহ্ ১৯ ডিসেম্বর, ২০০০ইং)।

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সব কিছু উৎসর্গের মাঝেই বিজয় নিহিত

আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আগামী শতাব্দীতে পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে যাবে আর খোদাতাআলার পক্ষ থেকে বিস্ময়কর সমর্থনকারী নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করা হবে।

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৭ মার্চ, ১৯৮৯ইং তারিখ, মসজিদে ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

আমাদেরকে অনেক মহান কাজ করতে হবে যার জন্যে আগামী শতাব্দীর প্রেক্ষাপট নির্ধারিত হয়ে আছে আর আমাদের ওপরে অনেক নতুন নতুন দায়িত্ব অর্পণের অপেক্ষায় রয়েছে।

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরে হুযূর (আইঃ) সূরাতু ত্বা-হা এর ১০৬ থেকে ১০৯ নং আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন যার অর্থ হলো ঃ

"আর তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। সুতরাং তুমি বলো, আমার প্রভু-প্রতিপালক সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন; এবং তিনি সেগুলোকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন ;

ওগুলোর মধ্যে তুমি কোন বক্রতাও দেখবে না আর কোন উচ্চতাও নয়।'

সেদিন লোকেরা একজন আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে যার (শিক্ষার) মধ্যে কোনরূপ বক্রতা থাকবে না এবং রহমান (আল্লাহ্)-এর সম্মুখে (সকল) আওয়াজ নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, তখন তুমি চাপা গুঞ্জন বতীত কিছুই শুনতে পাবে না"

যেভাবে প্রতিবছর পবিত্র রমযানের শেষের দিনগুলোতে একটি জুমুআ আসে যাকে আমরা 'জুমুআতুল বিদা' বলে থাকি। এভাবে আহমদীয়তের প্রথম শতাব্দীর শেষে আজ ঐ জুমুআ যাকে আমরা এ শতাব্দীর 'জুমুআতুল বিদা' বলতে পারি। যতই সময় ঘনিয়ে আসছে অন্তরের ধুক্-ধুকানি অধিকতর তীব্র হ'তে চলে যাচ্ছে, আর আজ সকালে হল্যান্ড নিবাসী ইংল্যান্ডের আমীর সাহেব ফোনে কথা বলছিলেন। তখন তিনিও থেমে থেমে ইহা বল্লেন, এখন তো এমন মনে হচ্ছে, যেভাবে

দ্রুতগামী গাড়ীতে বসে আমরা আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। যেভাবে উড়োজাহাজ আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় থাকে তার তুলনায় যখন বিমান বন্দরে অবতরণ ক'রে থাকে তখন গতি খুব দ্রুত বলে অনুভূত হয়ে থাকে। এখন কেবল উহাই মনে হয় না যে, মানুষ বিমানে বসে আছে, বিমান বন্দরের দিকে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বরং এমন মনে হয়ে থাকে যে, বিমান বন্দরও খুবই তীব্র বেগে এই যাত্রীবাহী বিমানের দিকে এগিয়ে আসছে। তখন তো ঐরকম অবস্থাই সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর সারা বিশ্ব থেকে আহমদী নর-নারী ও শিশুদের যে পত্রসমূহ পাওয়া যাচ্ছে তাতে এমন মনে হচ্ছে যে, সারা বিশ্বের আহমদীদের অন্তরে এক মহান উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে গেছে। সকলেই খুব দ্রুত বেগে বিভিন্ন রঙ্গে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আবার বিভিন্ন দেশের লোক নিজ নিজ ভাষায় বিভিন্ন গীত রচনা করছে যা কিনা আনসারও রেকর্ড করে পাঠাচ্ছে, খোদ্দামও পাঠাচ্ছে, লাজনাও নাসেরাতও। আর ইংল্যান্ড সম্বন্ধে আমি জানতে পেরেছি যে, এখানে এ ধরনের গীত প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই এমন সব গীতের দিন এসে গেছে যাতে আমরা খোদাতাআলার প্রশংসার গীত গাইবো এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে এন্তার দুরূদ পাঠাবো এবং এভাবেই প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের সাথে আর দুরূদের রাগ-রাগিনীর সাথে আর খোদার প্রশংসার গীত গাইতে গাইতে আমরা ইনশাআল্লাহ্ আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করবো।

আমি ইহা দেখতে আছি যে, আগামী শতাব্দীতে পরিবেশ পরিবর্তন হতে যাচ্ছে আর খোদাতাআলার পক্ষ থেকে বিস্ময়কর সমর্থনকারী নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করা হবে। খুবই মহান কার্যাবলী আমাদের সাধন করতে হবে যার জন্যে আগামী শতাব্দীর প্রেক্ষাপট নির্ধারিত হয়ে আছে। আর অনেক নতুন নতুন দায়িত্ব আমাদের ওপরে অর্পিত হতে যাচ্ছে। এর জন্যে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু যে কাজ আমাদের করতে হবে আর সে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি উহা দেখে কখনও কখনও ইহা মনে হয় যেন সামনে বিরাট পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, যা দূরীভূত করার শক্তি আমাদের নেই। আর ঐ পাহাড় এমন যা বড়ই গর্বের সাথে স্বীয় চূড়াগুলো সমুন্নত করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেরকে এমন হেয় দৃষ্টিতে দেখছে এবং এমনভাবে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে যে, তোমরা কারা আর হয়েছোটা কী যে, আমাদের উচ্চতাকে অতিক্রম করতে এবং অপসারণ করতে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছো?! চারিদিকে এমনই পরিবেশ। প্রত্যেক দিক থেকে আহমদীয়তের জন্যে প্রতিবন্ধকতা খাড়া করানো হচ্ছে এবং পথের সব প্রতিবন্ধকতা যা আগেও ছিলো সেগুলোকেও উচ্চতর করা হচ্ছে। আগে ব্যক্তি বিশেষ এ দাবী করতো যে, আমরা আহমদীয়তকে মিটিয়ে দেবো। আর পরিকল্পনাসমূহ তৈরী করতো, পরে দলগুলোও এ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। আবার বিভিন্ন দেশের দলগুলো একত্র এবং এখন সরকারগুলো এ কাজ নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে আর সরকারী দলগুলো এ ব্যাপারে একত্রিত হচ্ছে যে, যেভাবেই হোক না কেন আহমদীয়তের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে এর উন্নতির সব পথকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়।

এমতাবস্থায় কতক দুর্বলতা মানুষ মনে করতে পারে, ইহা আমাদের বোকামী যে, আমরা বড় বড় দাবী করে নিজেদের অন্তরকে সুপ্রসারিত করি। কিন্তু অন্তর প্রসারের সাথে ইহা আবশ্যক তো নয় যে, আমাদের দেহের আকার আকৃতিও বৃদ্ধি পায় এবং সুউচ্চ দাবী করার ফল ইহাতে নির্ণীত হয় না যে, আমাদের মধ্যে বিরাট শক্তির সঞ্চার ঘটে। একদিক থেকে তাদের একথা যথার্থ এবং নিশ্চয় যথার্থ যে, অন্তর প্রসারিত হলে দেহ সুদীর্ঘ হয়ে যায় না, শক্তির কথা বল্লে, দেহগুলোতে সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু যে বিশ্বে আমরা এসব দাবী করছি ঐ বিশ্ব সাধারণ বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র। উহা ধর্মীয় বিশ্ব আর উহা ঐ বিশ্ব যে সম্বন্ধে অন্যান্য বিশ্ব থেকে একেবারে স্বতন্ত্র একটি ইতিহাস কুরআন করীম উপস্থাপন করেছে। আর আমাদের সম্মুখে এমন নীতিসমূহ উন্মোচন করে রেখেছে যেগুলোর প্রয়োগ ধর্মীয় জগতে হয়ে থাকে, আর এসব নীতি কেবল ধর্মীয় বিশ্বের সাথেই সম্পর্ক রাখে না। যখন অন্য জগতের নীতিমালার সাথে এসব নীতির সংঘাত সৃষ্টি হয় তখন এসব নীতিকে প্রাধান্য প্রদান করা হয় এবং ওগুলোর সাথে সংঘাত দ্বারা অন্যান্য নীতিমালাকে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়। ইহা ঐ বিষয়-বস্তু যা কুরআন করীম আমাদের সম্মুখে বারে বারে সুস্পষ্টভাবে উন্মোচন করে চলেছে।

অতএব আমাদের সুউচ্চ দাবীসমূহ পাগলের প্রলাপ নয় বরং জ্ঞানবানদের কথা, যার পেছনে খোদার বাণী রয়েছে আর এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এবং যার পেছনে নবীদের সমস্ত ইতিহাস দন্ডায়মান রয়েছে এবং ওগুলোকে সাহস ও সান্ত্বনা যোগাচ্ছে যে, **সম্মুখে অগ্রসর হও। বিশ্বের কোন শক্তি তোমাদের কেশও বক্র করতে পারবে না। সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই তোমাদের ললাটে লেখা আছে। এজন্যে খোদাতাআলার ওপরে ভরসা করে, দোয়া করতে করতে নির্ভয়ে সম্মুখ থেকে সম্মুখে এগিয়ে যাও।** কুরআন করীমের যে আয়াত আমি তিলাওয়াত করেছি এতে এই বিষয়-বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যখন দাবী করেছিলেন যে, আমি তোমাদের দৃষ্টিতে আরবের একজন সাধারণ নিরক্ষর বাসিন্দা আর যখন তোমরা আমার নিকট থেকে এসব কথা শুনে থাকো যে, আমি আরব জয় করবো তখন তোমরা খুবই হেয় দৃষ্টিতে দেখে থাকো এবং নিজেদের মধ্যে যখন সভা করো তখন আমাকে 'পাগল' বলে থাকো। বলে থাকো, আশ্চর্যজনক কথা বলছে! কিন্তু তোমরা আরবের ওপরে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে তো আশ্চর্য হচ্ছো অথচ খোদাতো সমগ্র বিশ্ব বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সমগ্র বিশ্বকে আমার সত্যতার পদ-চুম্বন করানো হবে। এ দাবী ছিলো তখন, যখন হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভাষায় পৃথিবী শুনলো, তখন আরও আশ্চর্যান্বিত হলো ও উহার সাথে ঠাট্টা-তামাশা করলো। কিন্তু খোদাতাআলা – ঐ সময় বিশ্বের অবস্থা কীরূপ ছিলো আর তারা হুযূর আকরম (সঃ)-কে কী কী প্রশ্ন করতো এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওসবের মোকাবেলায় কী কী অবস্থা ছিলো এবং খোদাতাআলার পক্ষ থেকে কীভাবে ঐ সব দিনে মহান সুসংবাদসমূহ শুনতে ছিলো - এ বিষয়-বস্তুই এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্তাআলা বলেন, **ওয়া ইয়াসআলুনাকা আনিল জিবাল-** [অর্থাৎ, আর তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে (সূরা ত্বা-হা ঃ ১০৬)] হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার নিকট তারা পাহাড়গুলোর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে। আরবের একটি পাহাড়ের কথা হচ্ছে না। তুমি তো এ দাবী করে বসেছো যে, সারা বিশ্বের পাহাড়গুলোকে জয় করবে। এজন্যে এখন আরবীদের প্রশ্ন একটি পাহাড়ের সম্বন্ধে থাকলো না। তারা তোমাকে ইহা জিজ্ঞেস করে, তুমি এ বিশ্বের বিরাট বিরাট পাহাড়ের প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে? তুমি সর্ব প্রকার কঠিন অবস্থার ওপরে

বিজয়ী হবে? বড় বড় সাম্রাজ্য আরবের ডানেও খাড়া ছিলো এবং বামেও খাড়া ছিলো। এক দিকে রোম সাম্রাজ্যের মত পাহাড় ছিলো। ইহা হাজার হাজার মাইল ধরে চূড়ার ন্যায় ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃত ছিলো। অন্য দিকে ছিলো পারশ্য সাম্রাজ্যের মত পাহাড়। তা-ও হাজার হাজার মাইল একাধারে বিস্তৃত ছিলে। এর পরে বিশ্বের আরও অন্যান্য শক্তিধররা ছিলো। চীন সাম্রাজ্যও ছিলো। যাদের কিম্বদন্তী আরব পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। কিন্তু এর সাথে খুব কম লোকই ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলো। তাই আরবের লোকেরা যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হেওয়া আলিহিওয়া সাল্লামের এ দাবীর কথা শুনলো তখন তাদের দাবি অবশ্যই এসব শক্তিধরদের ওপরে গিয়ে পড়ে থাকবে। আর তারা চিন্তা করে থাকবে যে, এ কীরূপ দাবী করছে! আমরা তো একেবারে দুর্বল ও নিঃসহায় এবং শক্তিহীন দেখছি আর সে কিনা বলছে, সারা বিশ্বের বিরাট বিরাট পাহাড়স্বরূপ সাম্রাজ্যগুলোকে পরাজিত করবে? সুতরাং এ দৃশ্যকে একটি কথায় সংরক্ষিত করতে গিয়ে কুরআন করীম এর চিত্র এভাবে অংকণ করেছে- **ওয়া ইয়াস্‌য়ালুনাকা আনিল জিবাল**- হে মুহাম্মদ (সঃ)! তারা তোমার নিকট অনেক পাহাড় সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে- **ফাকুল ইয়ানসিফুহা রব্বি নাসফান** [অতএব তুমি বলো, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন (২০ঃ১০৬ আয়াতাংশ)] এদেরকে বলে দাও, অবশ্য আমার শক্তি নেই যে, পাহাড়গুলোকে উলট-পালট করে দিই কিন্তু **ইয়ানসিফুহা রব্বি নাসফান**-আমার খোদা আমার প্রভু-প্রতিপালক এসব পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। **ফাইয়াযরুহা কাআন সাফসাফান**- এবং তিনি সেগুলোকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন।

(২০ঃ১০৭) **লা তারা ফীহা ইওয়াজাঁওয়ালা আমতান**-ওগুলোর মধ্যে তোমরা কোন বক্রতাও দেখবে না আর কোন উচ্চতাও নয় (২০ঃ১০৮)। ওগুলোর সব পাহাড়ই সমতল ভূমির ন্যায় দেখা যাবে। **ইয়াও মাই যিইঁয়াত্তা বিউনাদ্‌ দাইয়া লা 'ইওয়াজালাহূ** - অবশ্যই এদিন আসবে যখন সেই দাবীকারকরা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর দাসত্ব করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে আর তাঁর (সঃ) আনুগত্য না করে তাদের গত্যান্তর থাকবে না। **লা'ই ওয়াজা লাহূ** - যার মধ্যে তোমরা কোন বক্রতা দেখতে পাবে না। সব দিক থেকে সোজা সব দিক থেকে সরল- সুদৃঢ় রাস্তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত আর কোন দিক থেকেও যদি তোমরা অন্বেষণ করার চেষ্টা করো তাহলে উহার কর্ম-কান্ডে তোমরা কোন কমৃতি, কোন বক্রতা দেখতে পাবে না। **ওয়া খাশা'আতি আসওয়াতু লির রহমানি ফালা তাসমা'উ ইল্লা হামসা** [অর্থাৎ, এবং 'রহমান' আল্লাহ্‌র সম্মুখে (সকল) আওয়াজ নিস্তব্ধ হয়ে যাবে তখন তুমি চাপা গুঞ্জন ব্যতীত কিছুই শুনতে পাবে না] তখন এসব হাঁক ডাক যা কিনা আজ খুব বড় বড় কথা বলছে আর উচ্চকিত হচ্ছে এবং পাহাড়ের উচ্চতার কাহিনী শুনাচ্ছে স্বয়ং এতই বিস্তারিত হয়ে যাবে আর খোদার ভয়ে এমনভাবে চাপা পড়ে যাবে যে, তোমাদের ব্যতিরেকে ঐসব লোকদের কানাঘুষারও কোন শব্দ আর শুনা যাবে না।

এ সেই অঙ্গীকার যা খোদাতাআলা আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহিওয়া সাল্লামের সাথে করেছিলেন। আর এর কিছু দিন পরেই আমরা প্রকৃতপক্ষে বিরাট বিরাট পাহাড়সম সাম্রাজ্যগুলোকে উলট-পালট ও বিধ্বস্ত হ'তে দেখেছি এবং ওগুলো ইসলামের ঘোড়াগুলোর সম্মুখে সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামের বাণী তাদের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বক্ষ থেকে পথসমূহ নির্গত আগামী বিশ্বের দিকে অগ্রগামী হতে থেকেছে। তাই যে ভবিষ্যদ্বাণী একবার ঐতিহাসিক বিশ্ব অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখে নিয়েছে, সেক্ষেত্রে তোমরা কেন আশ্চর্য হচ্ছো যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বিতীয় বার পূর্ণ হবে না। যেন ইহা স্বীয় গন্তব্যস্থলে পৌছানো ব্যতিরেকে অর্ধেক রাস্তায় থেমে বসে যাবে, ইহা অবশ্যই হবে না।

আজও বিশ্বের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য সদৃশ্য পাহাড় নিশ্চিতভাবে ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজও নিঃসন্দেহে তাদের মোকাবেলায় আমাদের এতটাও শক্তি নেই যতটা বিশ্বের অন্যান্য বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যগুলোর মোকাবেলায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের আরব দাসদের ছিল। কিন্তু আজও সেই খোদা আছেন, ঐ মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের খোদা, যিনি ১৪০০ বছর পূর্বে ছিলেন। আমরা নই আমদের খোদা এসব পাহাড়কে অবশ্যই টুকরো করে দেবেন। আর আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, **আগামী শতাব্দীতে তোমরা এ দৃশ্যাবলী দেখবে যে, বিরাট বিরাট শক্তির পাহাড় উলট-পাল্টা হয়ে সমতল ভূমির ন্যায় তোমাদের সম্মুখে বিস্তৃত হয়ে যেতে থাকবে এবং আহমদীয়তের বিজয়ের ঘোড়াগুলো– ইসলামেরই বিজয়ের ঘোড়াগুলো টগবগিয়ে তাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাবে। আবার আগামী বিশ্বকে বিজয়ের পরে একের পর এক বিশ্বগুলোকে বিজয় করতে করতে চলে যাবে।**

অতএব পাহাড়গুলোকে ওলট-পালট হ'তে দেখা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। আর ধর্মীয় বিশ্বে এরকম হয়েই এসেছে। আর ইহা খোদারই শক্তি যা কিনা এরূপ করে থাকে। এ বিষয়-বস্তুর ওপরে চিন্তা করার দ্বারা যেখানে মহান উৎসাহ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়- অবশ্যই সৃষ্টি হয়- এতদ্‌দ্বারা আমাদের সংকল্প সমূহের শির উন্নত হয় সেখানে বিনয়ের শিরও ঝুঁকে থাকে, সেখানে বিনয়ের নতুন শিক্ষা লাভ করি, সেখানে আমরা এ বাণীও লাভ করে থাকি যে, নিজেদের শক্তিতে, নিজেদের প্রজ্ঞা দ্বারা এবং নিজেদের সতর্কতার কথা বলতে বলতে বিশ্বে কোন কাজ সমাধা করতে পারবো না - **ইয়ানসিফুহা রব্বি নাসফান** - যদি আমাদের মোকাবেলায় বিরাট বিরাট শক্তিসমূহকে কোন শক্তি পর্যুদস্ত করে তাহলে তা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের শক্তি, আমাদের নিজেদের শক্তিতে তা সম্ভব নয়। অতএব যদি এ বাণী তোমরা ভুলে বসো তাহলে কোন পাহাড় তোমাদের জন্যে বিনত হবে না। কোন পাহাড়কে পদানত করতে তোমরা শক্তি রাখবে না। এজন্যে **ইসলামের মস্তক সমুন্নত করার খাতিরে এ শতাব্দী থেকে তোমাদের শির বিনত করার ও আগামী শতাব্দীতে ইসলামের শির উন্নীত করার খাতিরে নিজেদের শির বিনত করে প্রবেশ করো। বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রবেশ করো। দোয়া করতে করতে প্রবেশ করো। আনন্দের গীত অবশ্যই গাও। কিন্তু এ পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে যে, আমাদের একজন খোদা আছেন যিনি আমাদের পৃষ্ঠ-পোষকতার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। আর আমাদের মধ্যে কোন শক্তি নেই যতক্ষণ পর্যন্ত এ খোদার সাহায্য আমাদের সাহায্যের জন্যে না আসে আমরা একটি আঙ্গুলও হেলাতে সক্ষম নই, এক পা-ও সামনে অগ্রসর হবার শক্তি রাখি না। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার শক্তিও আমাদের নেই।** এসব এ আয়াতেই সম্ভব যদি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যের আহ্বান প্রবহমান হয়। যদি এ বিনয়ের সাথে সম্মুখে আগাও তাহলে

খোদাতাআলার অমোঘ নিয়তি তোমাদেরকে এমন দৃশ্যাবলী দেখাবে যে, খুবই নগণ্য ও হেয় বস্তুসমূহ বিশ্বে আশ্চর্য মর্যাদা ও মাহাত্ম্য লাভ করবে। একটি দৃশ্য তোমরা এ দেখেছো যে, পাহাড়গুলোকে উলট-পালট করে দেয়া হয়েছে আর অণু-পরমাণুতে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। ওটাই হলো খোদাতাআলার অমোঘ নিয়তি যে, বিরাট কাজ করে দেখায় এবং এমন দৃশ্যাবলীও দেখায় যা, বিন্দুকে পাহাড় বানিয়ে দেয়া হয়েছে আর অণু-পরমাণুকে উচ্চতা দান করা হয়েছে ও মর্যাদা এবং মাহাত্ম্য দান করা হয়েছে।

অতএব যতটা অন্যদের সাথে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের শত্রুদের বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার সম্পর্ক, স্মরণ রাখো, খোদা তাদের বিনাশ করে দেবেন অথচ তোমাদের দ্বারা মিটানো যেতে পারে না। যতটা তোমাদের মাহাত্ম্য লাভের সম্পর্ক স্মরণ রাখো, খোদার হাতেই এসব মাহাত্ম্য রয়েছে। কিন্তু তিনি কেবল বিনয়ী বান্দাগণকে এসব মাহাত্ম্য দান করে থাকেন। আর এমন হওয়া যে, অণুর পাহাড়ে পরিণত হওয়া কোন অসম্ভব কথা নয়। আপনারা অবহিত আছেন সে, সাগরে প্রবাল কীটের কী মূল্য! বিরাট বিরাট সমুদ্রের তুলনায় সামুদ্রিক প্রবাল কীট কোন মূল্যই রাখে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের অস্তিত্বগুলো একেবারেই নগণ্য। পৃথিবীর অন্যান্য জীবিত সত্তাগুলো এদের ওপরে বিজয়ী হয়ে থাকে। আর এগুলোকে তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। চলৎ শক্তিহীন এ জীবনগুলোর শত্রুর কবল থেকে পালিয়ে যাবারও শক্তি থাকে না। কারও ওপরে আক্রমণ করার সামর্থ্যও তাদের থাকে না। অধিকতর দুর্বল প্রাণীর মধ্যে একটি প্রাণী আর আকৃতিতেও একেবারে ক্ষুদ্র। সমুদ্রের ঢেউ কখনও কখনও প্রবাল কীটকে তীরে নিক্ষেপ করে দিয়ে থাকে। তাই আপনারা দেখে থাকেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দুর্বল থেকে দুর্বলতর শিশুও ওগুলোর ওপরে আঘাত হানতে পারে। ওগুলোর নিজেদের প্রতিরক্ষার কোন শক্তি নেই। ঐ প্রবাল কীটগুলোই বিনয় ও নম্রতার সাথে জীবন দিতে দিতে সমুদ্রের তলদেশে, সমুদ্রের তলভূমিতে একের পরে এক পড়তে থাকে আর তারা এক জীবনে নয়, দ্বিতীয় জীবনে নয় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রজন্মেও এ আশা করতে পারে না, এতই দুর্বল, এতই ক্ষুদ্র যে, কখনও সমুদ্রের ঢেউয়ের উপরিভাগে মাথা উঁচু করতে পারবে। কিন্তু পরিপূর্ণ ধৈর্য-স্থৈর্যের সাথে ধারাবাহিকতার সাথে এক প্রজন্ম, পরে দ্বিতীয় প্রজন্ম-এর পরে তৃতীয় প্রজন্ম মরে গিয়ে সমুদ্রগর্ভ ভরাট করতে থাকে এমনকি এমন একটি সময় এসে যায় যে, সমুদ্র-পৃষ্ঠে প্রকৃতই তারা শির উঁচু করে থাকে। আর অন্য প্রাণীগুলো সেখানে নিরাপত্তা অন্বেষণ করে আর তাদের সমাধির ওপরে নতুন নতুন ভূমি ও নতুন নতুন জগৎ রচিত হয়। নতুন নতুন দ্বীপ অস্তিত্ব লাভ করে থাকে।

তাই আমাদের যোগ্যতা যদি প্রবাল কীটের চেয়ে অধিক না-ও হয় তবুও দুঃখ নেই। যদি আমাদের নিজেদের প্রতিরক্ষা করার সাধ্য না-ও থাকে তাহলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। **অবশ্যই একটি বিষয় আবশ্যক – সংকল্পের, দৃঢ়-বিশ্বাসের এবং ধারাবাহিক চেষ্টা-সাধনার। অনবরত ধারাবাহিকতার সাথে চেষ্টা করতে থাকো আর ইহা জেনে নাও যে, প্রবাল কীটের তৈরী দ্বীপও মানবমন্ডলীর জন্যে কল্যাণজনক হয়ে থাকে। কিন্তু আপনাদের লাশের ওপরে– আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের লাশের ওপরে ইসলামের যে দ্বীপ তৈরী হবে এখেকে অধিক কল্যাণজনক দ্বীপ কখনও বিশ্বের জন্যে কেউ তৈরী করবে না।** কিন্তু আপনাদের মোকাবেলা কোন এক সমুদ্রের একাংশের সাথে নয়। অন্যায়-অসত্যের পানি আজ সারা বিশ্বের (পুণ্যের) উচ্চ ভূখন্ডগুলোকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। আপনাদেরকে ধারাবাহিকতার সাথে এমন সব কুরবানী দিতে হবে যে, এক বা দু'টি দ্বীপ রচনা করা নয় বরং নতুন ভূখন্ডসমূহ তৈরী করতে হবে আর নতুন ভূখন্ডসমূহ প্রথমে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে নতুন আকাশ সৃষ্টি করার পরে তৈরী হয়ে থাকে।

অতএব **আকাশের সাথে নিজেদের সম্পর্ক বেঁধে নাও আর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করো এবং পরিপূর্ণ ভরসা করো আর বিনয়ের আঁচল ধরে নাও এবং ক্রমাগতভাবে চেষ্টা-সাধনা করতে থাকে।** একথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না- তোমরা আজ বিজয়ের মুখ কেন দেখতে পাচ্ছো না বা কাল বিজয়ের মুখ কেন দেখবে না। তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে খোদাতাআলার অমোঘ নিয়তি কেন আরও অপেক্ষা করাচ্ছে। এসব কথা মনে ঠাঁই দিও না। **তোমাদের বিজয়ের দিন হবে সেদিন যেদিন ইসলামের খাতিরে তোমরা উৎসর্গীত হয়ে যাবে।**

আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে ইসলামের পথে কুরবানী দিতে দিতে নিজের সত্তাকে নিঃশেষ করে দেয়, ঐদিন যেদিন সে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়- তার বিজয়ের দিন সেইদিনই। ইহাই ঐ রহস্য যা হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দাসদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরে ইসলামের জন্যে পরাজিত হওয়ার আর কোন প্রশ্নই অবশিষ্ট ছিলো না।

কোন এক ঘটনায় একজন সাহাবী (রাঃ)-কে শত্রুরা যখন ঘিরে ফেল্লো তখন ঐ জল্লাদ লেজা মেরে তাঁকে শহীদ করার আগেই, যখন ঐ জল্লাদ লেজা নিক্ষেপ করার জন্যে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো তখন তিনি উচ্চস্বরে ধ্বনি দিলেন – **ফুয্‌তু বিরব্বিল কা'বা – ফুয্‌তু বিরব্বিল কা'বা**- অর্থাৎ কা'বার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! আমি সফল হয়ে গেছি, কা'বার প্রভু-প্রতিপালকের কসম! আমি সফল হয়েছি। বিস্ময় ও আশ্চর্য হয়ে ঐসব লোক এ ধ্বনি শুনলো–যা ছিলো শহীদ হ'তে যাচ্ছে এমন এক ব্যক্তির শেষ মুহূর্তের ধ্বনি। আর উহা কতক প্রাণে এমনভাবে প্রোথিত হয়ে গেলো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রসঙ্গে আরও অধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইসলাম গ্রহণ না করলো ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্বস্তি লাভ হলো না।

অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দাসদের বিজয়ের যে একটি রহস্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন উহা ছিলো এই রহস্য যে, **তোমাদের বিজয়ের দিন হবে ঐ দিন, যখন তোমরা খোদার সমীপে নিজের সব কিছু উপস্থিত করে দাও।** আবার এ কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না যে, তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম কী দেখছে আর দেখছে না।

অতএব এ সংকল্প নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হও। আমি অবগত আছি যে, খোদার অমোঘ নিয়তি অবশ্য অবশ্যই বিরাট বিজয়সমূহ দেখাবে; কিন্তু আমি এ শিক্ষা দিচ্ছি এবং ইহা আমি কুরআন ও মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর শিক্ষা আপনাদেরকে দিচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে দিচ্ছি না যে, এসব বিজয়ের লালসায় সম্মুখে অগ্রসর হবে না, এসব বিজয়ের লোভে সম্মুখে অগ্রসর হবে না। কেননা, **প্রকৃত, আসল ও স্থায়ী বিজয় তোমাদের কুরবানীর দিন এবং তোমাদের কুরবানীর বিজয়।**

অতএব নিজেদের কুরবানীর জন্যে উৎসাহ সমুন্নত করতে গিয়ে আগের চেয়ে অধিক কুরবানীর আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প করে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করো আর খোদার নিকট এ

মিনতি করো যে, যখনই তোমার সকাশে আমাদের ফিরে আসার সময় হয় তখন আমরা যেন সফলতা লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। যদি এমন করে নাও তাহলে সব সময় সকল পদক্ষেপে বিজয়ের দিন এসে যাবে। প্রত্যেক মুহূর্তই আমাদের সফলতার মুহূর্ত হবে। আমাদের মধ্যে নবাগতরাও বিজয়ীর বেশে এ বিশ্বে আগমন করে থাকবে। আমাদের মধ্য থেকে যারা এ বিশ্ব থেকে বিদায় নিয়ে থাকবে তারাও বিজয়ীর বেশে এ বিশ্ব থেকে বিদায় নিয়ে থাকবে। এটা হবে সেই জামাত যাকে বিশ্বের কোন শক্তি পরাজিত ও পরাভূত করতে সক্ষম হবে না।

আমি প্রবাল কীটের উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে যেখানে ইহা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি এবং প্রাকৃতিক বিধানের একটি দৃশ্য দেখিয়েছি যে, মরণশীল নিকৃষ্ট লোকও, কুরবানীদাতা সর্বৈব নগণ্য অণু-পরমাণুও বীরত্বের সাথে সুদৃঢ়ভাবে চেষ্টা-সাধনার সাথে কুরবানীসমূহ পেশ করতে থাকলে ঐসব কুরবানীকে অবশ্যই সমুন্নত করা হয়, বিরাট সমুদ্রগুলোর ওপরে তাদের বিজয় দান করা হয়, সেখানে এ খুতবা শেষ করার পূর্বে আমি এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি যে, দ্বীপসমূহের ঐ অংশ সমুদ্র থেকে বাইরে শির বের করে, যদি নিজের উচ্চ সূর ওপরে দাম্ভিক হয়ে যায় আর স্বীয় উচ্চতার তুলনায় এসব নগণ্য অণু-পরমাণুকে হেয় প্রতিপন্ন করতে থাকে, যা কিনা ইহাকে সমুদ্রের নিম্নভাগে কোটি কোটি টন ওজনের নীচে চাপা আছে বলে মনে হয়ে থাকবে তাহলে তা খুবই মুর্খতার কাজ হবে।

প্রবলের ঐ প্রাথমিক প্রজন্ম যারা সমুদ্রের নিম্নদেশে বাহ্যিকভাবে দৃশ্যপটে দৃশ্যমান হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিজেদের মৃতদেহগুলো বিছিয়ে দেয় তারা ঐ কথার জামিন হয়ে থাকে যে, তাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম অবশ্যই সফলতার মুখ দেখবে। আর সবচে' সফল প্রজন্ম তারাই যারা সর্বাগ্রে উন্নতির সূক্ষ্ম পন্থাগুলো শিখিয়ে থাকে। কুরবানীর পথসমূহ অতিক্রম করার রীতিসমূহ বলে দেয়। এর ওপরে যতই উঁচু অট্টালিকা নির্মিত হতে থাকুক না কেন। তারা সর্বকালের জন্যে সামান্য, তুচ্ছ স্তরের প্রতি অনুগ্রহভাজন থাকে।

অতএব নিজেদের ঐসব বুযূর্গদের অনুগ্রহকে ভুলবেন না। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বেই তাঁরা চলে গিয়ে থাকুন না কেন বা কয়েকদিন পূর্বেই গিয়ে থাকুন না কেন অথবা কয়েক মুহূর্ত আগেই গিয়ে থাকুন না কেন ঐ শতাব্দীতেই গিয়ে থাকুন না কেন কিম্বা চৌদ্দশ' বছর পূর্বে ঐসব কুরবানীদাতা 'প্রবাল কীট' যাঁরা খোদার পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতেন যার ওপরে ইসলামের উঁচু উঁচু সৌধ নির্মিত হয়েছে এবং এ বিরাট দ্বীপ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ঐসব লোক আমাদের দোয়ার বিশেষ হকদার ও মুখাপেক্ষী। তাঁরা মুখাপেক্ষী নয় আমরা মুখাপেক্ষী যেন তাঁদের জন্যে দোয়া করি এবং তাঁরা হকদার যেন আমরা তাঁদের জন্যে দোয়া করি আর আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী যেন আমরা তাঁদের জন্যে দোয়া করি এবং তাঁদের চিন্তাধারা থেকে আমরা ঐ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করি যা কিনা বিনয় ও নম্রতার জন্যে আবশ্যক হয়ে থাকে।

বিনয় কেবল মুখের কথায় লাভ হয় না। স্মরণ রেখো, বড় বড় এমন আত্মম্ভরী লোক ছিলো যারা নিজেদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতো, আমরা তো কোন কিছুই নই। বড় বড় এমন সুদের কারবারী ও ধনী এবং কারখানার মালিক আছে তাদের মধ্যে কতক নিজেদের মর্যাদা এভাবে বর্ণনা করে থাকে, বৈঠকে বসে বলে, আমরা মজুর বৈ তো নই। আমাদের দৈনন্দিন জীবন তো মজুর খাটতে খাটতেই কেটে যায়। তোমরা কী জানো, আমাদের কী অস্তিত্ব আছে?! আর তারা মনে করে যে, এমন করে বলার মধ্যেই তাদের মর্যাদা নিহিত। একজন কোটিপতি মজুর যে কিনা লক্ষ লক্ষ লোকের ওপরে কর্তৃত্ব খাটায় তার এমন বিনয়ের কথা মিথ্যা-কৌশল ও ভিত্তিহীন। বিনয় অবলম্বন করারও তত্ত্ব-কথা জানা আবশ্যক। আর যদি আপনারা আপনাদের পুরোনো বুযূর্গদেরকে এসব মহান সময়গুলোতে স্মরণ রাখেন যা খোদাতাআলা স্বীয় আশিসক্রমে দান করে থাকেন তাহলে আপনাদের প্রকৃত বিনয়ের তত্ত্ব-কথা লাভ হবে। তখন আপনি অবহিত হবেন যে, আপনি আপনার সহায় সম্পদ কোন কিছুরই অধিকারী নন।

ঐসব লোক যাঁরা প্রথমে এসে গেছেন, যাঁরা পুণ্যের রীতি-নীতি শিখিয়ে গেছেন, যাঁরা তোমাদেরকে কুরবানীর পদ্ধতিসমূহ শিখিয়েছেন, যাঁরা এ সব ভঙ্গীমা শিখিয়ে গেছেন যা খোদার দৃষ্টিতে প্রিয় প্রতীয়মান, ঐসব লোক তাঁরাই যাঁরা এ শতাব্দীতে প্রবেশ করার সময় সবচে' হকদার যে, আমরা দোয়ার সময়ে তাঁদেরকে স্মরণে রাখি এবং তাঁদের স্মরণকে সমুন্নত করা হয় যেভাবে খোদা ও রসূলের স্মরণকে সমুন্নত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে আমি ইতঃপূর্বে আফ্রিকা ভ্রমণে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম (জানিনা এর ওপরে কতটা কাজ করা হয়েছে) যে, নিজেদের বুযূর্গদের পুণ্য-কর্মকে স্মরণ রাখা উচিত তাঁদের অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ করে তাঁদের জন্যে দোয়া করা এমন এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে, সামগ্রিকভাবে নয় বরং প্রত্যেক ঘরে আমাদের ইহাকে প্রসার ঘটানো উচিত। সুতরাং কেনিয়ার কথাই বলা যাক, সেখানে একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলাম, যে সমস্ত বুযূর্গ, যাঁরা প্রথমে কেনিয়া পৌছেছিলেন যাঁরা এখানে এসে কুরবানী করেছিলেন, জামাতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের বিবরণ সংগ্রহ করো। এসব অবস্থাকে জাগ্রত রাখা তোমাদের অব্যশ কর্তব্য নচেৎ তোমরা জীবিত থাকতে পারবে না।

আমি খুব আশ্চার্যান্বিত হলাম ও বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আশ্চার্যান্বিত হলাম যখন আমি যুবক প্রজন্মকে তাদের পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম তখন জানতে পারলাম যে, অধিকাংশই এ ব্যাপারে একেবারে অনবহিত। নাম জানে। ইহা জানা ছিলো যে, অমুক যুগে কোন এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। কতকের ইহা জানা ছিলো যে, তাঁর সমাধি কোথায় আছে। কতকের ইহাও জানা ছিলো না যে, তাঁর সমাধি কোথায়। ঐ দাদা যিনি কোন এক সময়ে এসেছিলেন বা বড় আব্বা কোন এক সময়ে এসেছিলেন। কতকের ইহাও জানা ছিলো না তিনি কোথায়? সুতরাং আমি তাদেরকে বল্লাম, এঁরা তো মহান উৎসর্গকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁরাই সেই ভিত্তি রেখেছিলেন, যার ওপরে আজ তোমরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদেরকে নিজেরা একটি সৌধের মত দেখছো। তাই ঐ কমিটি খুব ভাল কাজ করেছে। এক সময় পর্যন্ত তাদের সাথে আমার যোগাযোগ ছিলো। কতক বুযূর্গের অবস্থা সংগ্রহ করেছিলো যা কিনা দৃষ্টির আড়ালে লুক্কায়িত ছিলো।

এজন্যে প্রত্যেক পরিবারের নিজেদের বুযূর্গদের ইতিহাস সংগ্রহ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এ ইতিহাস তাঁদের বাহাদুরী প্রকাশের খাতিরে নয় বরং আপনাদেরকে বাহাদূরী প্রদানের জন্যে। তাঁদের দৃষ্টান্তগুলোকে জীবিত করার লক্ষ্যে তাঁদের ঘটনাগুলোকে সংরক্ষিত করা এবং পরে নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মকে বলা যে, এঁরা ঐসব

লোক যাঁরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ছিলেন। কোন্ অবস্থায় কীভাবে ঐসব লোক ধর্মের সেবা করতেন। কীভাবে তাঁরা চলা-ফেরা করতেন। কীভাবে বসতেন, পোষাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিলো, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কীরূপ ছিলো। আমার স্মরণ আছে, একবার সিয়ালকোট পরিদর্শনে গেলাম। তখন আমি আনসারুল্লাহ্‌র সদর। আমার সাথে মোকাররম চৌধুরী মুহাম্মদ আসলাম সাহেব, যিনি শিয়ালকোট আনসারুল্লাহ্ শাখার সদর ছিলেন। ইনি মোকাররম চৌধুরী শাহনাওয়ায সাহেবের ভাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ভ্রমণ ঐ রাস্তা দিয়ে হয়েছিলো, যে রাস্তা দিয়ে কোন এক সময়ে তারা শিশুকালে তাঁদের পিতাকে ঐসব নতুন আহমদীদের সাথে চলা-ফেরা করতে দেখতেন, যারা দলে দলে কাদিয়ান গিয়ে থাকতেন। ঐ দৃশ্য আশ্চর্য রকমের তৃপ্তিদায়ক ছিলো যে, সম্ভবতঃ আমাদের ঘোড়ার গাড়ী ছিলো বা মোটর গাড়ী। যখন এসব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো তখন এক একটি স্মৃতি তাঁর মনে জাগরূক হচ্ছিলো আর তিনি বলে যাচ্ছিলেন যে, যদিও সামর্থ্য ছিলো কিন্তু আমাদের আব্বাজান মরহুম এতে খুব বেশী স্বাদ পেতেন যে, পায় হেঁটেই কাদিয়ান চলে যেতেন। সুতরাং গ্রামের পর গ্রাম থেকে ছোট ছোট দল এ দলের সাথে যোগ দিয়ে চলে যেতেন আর ইহা একটি মিছিলের রূপ ধারণ করতো। কোন কোন লোক পাঞ্জাবী গীত গাইতে গাইতে উচ্চস্বরে ভাল ভাল কথা বলতে বলতে এ দলের জাঁকজমক বাড়িয়ে দিতেন।

আর নতুন আধ্যাত্মিক স্বাদসমূহ তাদেরকে দিতেন। তিনি বল্লেন, আমিও কয়েকবার হাতের আঙ্গুল ধরে তাদের সাথে গিয়েছিলাম। আমার অন্যান্য ভাইয়েরাও গিয়েছিলেন। এ মিছিলের ঐ সময় এবং ঐভাবে পায়ে হেঁটে মিছিলের ন্যায় কাদিয়ান যাওয়ার যে স্বাদ লাগতো ও রকম স্বাদ সারা জীবনভর আর পাই নি। স্বাদ তো লাগতো, বিভিন্ন রঙ্গের স্বাদ লাগতো কিন্তু ঐ কথা ছিলো। নিজস্ব রঙ্গে একটি পৃথক কথা। তাই ঐসব বুযূর্গদের কথা-বার্তা যেভাবে তারা ভালবাসার সাথে বলতেন, এতদ্দ্বারা আমার প্রাণও অসীম দোয়ায় ভরে গেলো আমি মনে করলাম হায়, পৃথিবীর সকল পরিবার যদি এভাবে বুযূর্গদের স্মরণে রাখে আর নিজেদের বুযূর্গদের আলোচনা নিজেদের পরিবারে নিজেদের সন্তানদের দ্বারা এরূপ করায়! তাদের মধ্যে কতক এমনও হয়ে থাকবে যাদের এমন সামর্থ্য হবে যে, তারা এসব ঘটনাকে পুস্তকাকারে ছাপিয়ে দেয়। কিন্তু আমি তাদেরকে একটি ব্যাপারে সতর্ক করতে চাচ্ছি যে, কখনও এমন ঘটনা সংগ্রহকারী সাবধানতা অবলম্বন করে না। নিজেদের স্মরণ শক্তির ত্রুটির কারণে এমন সব বর্ণনা যা কিনা অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে থাকে। কতক এমন কথা বর্ণনা করে দেয় যা অল্প বয়সের কারণে অপরিপক্ক জ্ঞান হেতু তা বুঝতে সক্ষম হয় নি। ঘটনা কোন ধরনে ঘটেছে অথচ বলা হয়েছে অন্যভাবে এবং এ শিশু অন্যভাবে ঝুঝে নিলো আর উহাই বলে বেড়ালো। তাই এমন বর্ণনাকারীকে অবশ্যই মিথ্যেবাদী তো বলা যেতে পারে না কিন্তু ভুল-ত্রুটি তো মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে আর এসব বর্ণনা এমনই মূল্যবান ও পবিত্র এবং জামাতের এমনই আমানত যে, ও তে আমরা ক্ষুদ্র ও সামান্য ভুল- ত্রুটিও পসন্দ করতে পারি না। এজন্যে **যদি কেউ এসব বুযূর্গদের অবস্থা এ উদ্দেশ্যে ছাপাতে চায় যে, অবশিষ্টরা এথেকে উপকৃত হয়, তাই তাদের চারিত্রিক ও জামাতী কর্তব্য যে, তারা প্রথমে জামাতের ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে অনুমতি নেয় এবং আলেমরা এসব পুস্তকাদি পাঠ করে একথা ভালভাবে পর্যালোচনা করেন যে, এমন কথা নেই তো যা কোন দিক থেকে জামাতের জন্যে ক্ষতিকর হয় বা ত্রুটিযুক্ত দাবী করে ফেল্লোই বা প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত দাম্ভিকতাপূর্ণ অবস্থা অবলম্বন করা হয়ে গিয়ে থাকে, যখন কিনা বাহাদূরীর বর্ণনায় বিনয় নম্রতার পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক। তাই এসব কথায় কত প্রকার বিপদের কথা অন্যায়ভাবে সৃষ্টি হতে পারে, এজন্যে এসব দৃষ্টিপটে রেখে আপনারা একাজ করুন।** আর আমি আশা রাখি যে, যদি বর্তমান প্রজন্মে এমন স্মরণ জীবিত হয় তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের স্মরণও সমুন্নত করবেন আর আপনারা স্মরণ রাখুন যে, আগামী প্রজন্মসমূহ এভাবে ভালবাসা ও প্রেমে নিজেদের শির আপনাদের অনুগ্রহের সম্মুখে মাথা ঝুঁকাতে ঝুঁকাতে আপনাদের পবিত্র স্মরণ জাগ্রত করবে এবং আপনাদের পুণ্যসমূহকে সর্বদা সঞ্জীবিত রাখবে। এভাবে ধারাবাহিকতার সাথে শতাব্দীর পরে শতাব্দীর প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে খোদাতাআলা এমন ব্যবস্থা করতে থাকবেন যে, জামাতের আবেগ উদ্বেলিত হবে, জামাতের সংকল্প পূর্বের চেয়েও অধিক দৃঢ় হবে। নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং অথচ আমানত যা কিনা খোদাতাআলা আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করেছেন উহাকে আমরা নিজেদের অমনোযোগিতার কারণে বিনষ্ট ও না করি।

আল্লাহ্ করুন যেন, আমরা এ মর্যাদার সাথে এবং এ বিনয়ের মর্যাদার সাথে, এ নির্ভরতায় ও এ নির্ভরতার মর্যাদার সাথে, এ দোয়ার দ্বারা এবং এ দোয়ার মর্যাদার সাথে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করি যে, **আমাদের পদক্ষেপ মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের পথের ওপরে সম্মুখে এগুতে থাকে আর এক পদক্ষেপও মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের পথসমূহ থেকে সড়ে গিয়ে সম্মুখে না এগুতে থাকে। খোদা করুন এমন যেন না হয়।**

(ইন্টারন্যাশনাল আল্ ফযল, জানুয়ারী ৫-১১, ২০০১ এর সৌজন্যে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

'আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহহিকহুম তাসহীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

জুমুআ ও জুমুআতুল বিদা' এবং ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১২ মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা জুমুআর ২-৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ তারপর হুযূর বলেন ঃ

'জুমআতুল বিদা'-এর মাহাত্ম্য কী ?

রমযানুল মুবারকে এক দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে সেই জুমুআ যাকে জুমুআতুল বিদা' বলা হয়, এসেই যায়। দীর্ঘ অপেক্ষা এই দিক দিয়ে যে, ঐ সকল লোক যাদের নামাযের অভ্যাস নেই এবং জুমুআয় আসার এবং রোযা রাখার অভ্যাস নেই তাদের জন্য তো সারা বছরে ইহাই একমাত্র জুমআ, যা তাদের জন্যে সব রকমের মাহাত্ম্য ও বরকত নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা সারা বছর অতিবাহিত করার পর রমযানুল-মুবারকের শেষপ্রান্তে এর অপেক্ষা করে। এর নাম রাখা হয়েছে জুমুআতুল-বিদা'। অর্থাৎ বিদায় গ্রহণকারী বা বিদায় প্রদানকারী জুমুআ। এই ধারায় আজ উক্ত জুমুআ এসেছে, যার পরে রমযান বিদায় নিবে এবং রমযানের ফলশ্রুতিতে যে সব বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তা থেকে অব্যাহতি লাভ হবে। এই হচ্ছে একপ্রকার ধ্যান-ধারণা, যা একটা প্রচলিত লৌকিক ভাবধারা। আর একটি ভাবধারা হচ্ছে, যা হযরতে আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন– তা এই যে, রমযানুল-মুবারকে হাতকড়া তো পরানো হয় কিন্তু তা পরানো হয় শয়তানকে। বাধা-নিষেধ আরোপিত হয় বটে, কিন্তু তা শৃঙ্খলস্বরূপ আরোপিত হয় শয়তানের উপরে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের জন্যে তো ইহা জান্নাতের সুসংবাদের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়। এ দু'টি হচ্ছে পরস্পর মুখোমুখী ও সংঘাতপূর্ণ ভাবধারা, যা ইসলামের আবির্ভাবের পর, প্রারম্ভিককাল থেকে না হলেও (কিছুকাল পর থেকেই) ক্রমাগতভাবে চলে আসছে। জুমুআতুল-বিদা'র মাহাত্ম্য সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা তদ্রূপই। কিন্তু আমি জানি না, ঠিক কবে থেকে এর সূচনা হয়েছে। কিন্তু পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশ এবং জগতের অন্যান্য সব অঞ্চলে যে এই ভাব-ধারণা ও লোক-বিশ্বাসটি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত, এর ইতিহাস খুব গভীর। বহু দীর্ঘকাল হ'তে প্রচলিত প্রথায় এর ব্যাপার-স্যাপার চলে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলাম যে, এই রমযানুল-মুবারকে জুমআতুল-বিদা' সম্পর্কে যখন আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবো তখন জুমুআতুল-বিদা' সম্পর্কিত বরকত ও আশিস কুরআন ও হাদীস থেকে বের করে বিশেষ উপহার হিসেবে পেশ করবো। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উলামাকে এর তথ্যানুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত করা হলো। সমুদয় হাদীস-গ্রন্থাবলী তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু ইশারা ইঙ্গিতেও কোথাও জুমুআতুল-বিদা'র উল্লেখ পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হলো না। তবে অবশ্য জুমুআতুল-মুবারকের

মাহাত্ম্য, আশিস ও বরকত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহুল বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়, যা প্রত্যেক জুমুআতুল-মুবারকের বরকত ও আশিস সম্পর্কেই বর্ণিত। কিন্তু মুসলমানরা এক আখেরী জুমুআর জন্য অপেক্ষা রত থাকবে এবং সেই জুমুআতে বরকত তালাশের জন্য অস্থির ও উদ্বিগ্ন হবে এরূপ ধারণার সন্ধান হাদীস ও সুন্নাহর কোথাও ইশারা-ইঙ্গিতেও লেশমাত্র পাওয়া গেল না। অবশ্য রমযানের আখেরী আশারার কল্যাণ ও মাহাত্ম্যের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। আর তেমনি প্রত্যেক জুমআ প্রসঙ্গে–উহা সারা বছরব্যাপী যখনই আসুক না কেন উহার বরকত ও কল্যাণের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। আজ আমি আপনাদের বিশেষভাবে জ্ঞাত করতে চাই যে, ঐ সকল মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নী তারা আহমদীয়া জামাতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হোন বা না হোন, যাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ নামায পড়ার অভ্যাস নেই, যারা সারা বছর কেবল এই এক পবিত্র দিনের আশায় ও অপেক্ষায় ছিলেন। আর আজ তাঁরা অসাধারণভাবে বিপুল সংখ্যায় মসজিদসমূহে সমবেত হয়েছেন– তাদের কাছে আমার এই আওয়াজ পৌছুতে পারে, অন্য সময় হয়ত না-ও পৌছুতে পারে–আল্লাহ্ই জানেন আবার মসজিদে আসার তাদের তওফীক হয়, কি না হয়, কিন্তু এবারের এই সুযোগটিতে আমি তাদেরকে জানাচ্ছি যে, জুমুআতুল-বিদা'র মাহাত্ম্যের উল্লেখ না কুরআন করীমে আছে, না কোন হাদীস ও সুন্নতে। সাহাবা-কেরামের আমলের দ্বারাও ইহার প্রমাণ নেই। অতএব, যে দিনটির আপনারা প্রতীক্ষায় ছিলেন, উহা তো এ দিক দিয়ে শূন্য সাব্যস্ত হলো।

জুমুআতুল মুবারকের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ঃ

কিন্তু জুমুআতুল মুবারকের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যের প্রভূত উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র কুরআনেও পরিলক্ষিত হয় এবং আহাদীস-নবুবীতেও। আর তা রয়েছে প্রত্যেক জুমুআতে। ইহা প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাদের কাছে আসে। এতদ্ব্যতীত নামাযের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণনার দ্বারাও সমস্ত কুরআন ভরে আছে। অর্থাৎ জুমুআতুল-বিদা' তো সারা বছরে মাত্র একবারই আসে। কিন্তু জুমআতুল-মুবারক প্রত্যেক সপ্তাহেই আসে এবং নামায প্রতিদিন পাঁচ বেলা। প্রতিদিন পাঁচবার আসে এই জিনিসটির উল্লেখ কুরআন করীমে এতো বিপুলরূপে পরিলক্ষিত হয় যে, অন্য কোন ইবাদত সম্পর্কে তদ্রূপ উল্লেখ নেই। এই সব নেক আমলের বরকতপূর্ণ ভান্ডারের দিক থেকে তো তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও ! আর কেবল এই একটি জুমুআর প্রতীক্ষা কর যার স্বতন্ত্রভাবে কোনও গুরুত্ব নেই। তবে এর দ্বারা এই একটি বরকতের তো অধিকারী হ'তে পার যদি জেনে যাও যে, ইবাদতের মধ্যেই বরকত

নিহিত। **ইবাদতের মধ্যেই খোদাতাআলার ফযল ও কৃপা নিহিত। ইবাদতের সঙ্গেই তাঁর সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত**। এবং এর সাথেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর মু'মিনের জন্যে ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আপনারা যখন মসজিদসমূহের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন দেখতে পান, অধিকাংশ মসজিদ এত বড় ও প্রশস্ত যে (ওগুলোর তুলনায় মুসল্লিদের সংখ্যা-স্বল্পতার কারণে) মনে হয় যেন অযথা এত বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আজ যে কোনও মসজিদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে ইহা দেখে অবাক হবেন যে, মসজিদগুলো থেকে মুসল্লিরা বাইরে উপচিয়ে পড়েছে। অলি-গলি ভরে গেছে। বাজারসমূহ বন্ধ করতে হয়েছে। লাহোর হোক, কি করাচী অথবা দুনিয়ার অন্যান্য যে কোন শহর-নগর–সেখানে মসজিদসমূহের সংলগ্ন রাস্তা-ঘাট ও বাজারগুলোতে প্রায়শঃ দেখতে পাবেন যে সামিয়ানা টানানো হয়েছে এবং যত্র-তত্র বাজারগুলোকে (Blockcade) করে বন্ধ করা হয়েছে, কেননা, আজ সেখানে মুসল্লিরা নামায আদায় করছে। এই মুসল্লিদের সম্পর্কে তো আল্লাহ্‌তাআলার প্রত্যাশা, তারা যেন প্রতিদিনই তাদের নিকটবর্তী মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করেন। তাহলে এবার আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, এক তো হলো সেই দৃষ্টিভঙ্গী যা কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রদর্শিত দৃষ্টিভঙ্গী যা বরকত ও কল্যাণ এবং ঐশী সন্তুষ্টি লাভ সম্পর্কে দেয়া আছে ; অপর এক দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে যা আজ দুনিয়াতে প্রচলিত। ইহার বশবর্তী হয়ে মুসলমানরা ইহাকেই নাজাত লাভের পথ বলে মনে করে। এই দু'টির মধ্যে যে কত পার্থক্য, কত বৈষম্য ! **প্রকৃত নাজাত খোদাতাআলার ইতায়াত বা আনুগত্যেই নিহিত। আর খোদাতাআলার আনুগত্য ইবাদত ব্যতিরেকে অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। ইবাদতই হচ্ছে সদর দুয়ার যা ইতায়াতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে**। এই দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবেন তবেই সব রকম ইতায়াতের সুযোগ ও সামর্থ্য আপনারা লাভ করতে পারবেন। যে ব্যক্তি এই দুয়ার নিজের জন্যে নিজেই বন্ধ করে নিয়েছে তার পক্ষে আদৌ কোন ইতায়াত হতে পারে না।

বা-জামাত নামাযের গুরুত্ব ঃ

নামাযের গুরুত্বের উপর, বরং বা-জামাত নামাযের গুরুত্বের উপর হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এতই জোর দিয়েছেন যে এক বার নামাযের পর তিনি (সঃ) বল্লেন, "দেখ, এখনও অর্থাৎ ফযরের নামাযের সময়েও কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা তাদের গৃহে ঘুমিয়ে আছে। যদি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে আমার জন্যে অনুমতি হতো তাহলে উপস্থিত মুসল্লিদের মাথায় করে খড়ির বোঝা বয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ সকল ঘুমন্ত লোকদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী সহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি আমাকে দেয়া হয় নি। আমাকে মানুষের উপর দারোগা নিযুক্ত করা হয় নি। হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) অপেক্ষা কোমল হৃদয়, দয়ার সাগর পৃথিবীময় অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া তো দূরে থাক, কল্পনার জগতেও পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "বিল মু'মিনীনা রউফুর রহীম" অর্থাৎ "যখনই কোন কিছু তোমাদের কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয় উহা তাঁর পক্ষে অসহনীয়।" আয়াতটির এই প্রথম অংশ সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র সব বান্দাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু বিশেষভাবে মু'মিনদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যেমন 'রউফ ও রহীম'–স্নেহশীল ও দয়াবান এবং বারংবার করুণা বর্ষণকারী, ঠিক তদ্রূপ এই রসূলও (সঃ) মু'মিনদের পক্ষে 'রউফ' ও 'রহীম'। এহেন রসূলের মুখ দিয়েই ঐ বাক্যটি নিঃসৃত হয়েছে যে, "আমার জন্যে যদি অনুমতি থাকতো তাহলে মুসল্লিদের মাথায় খড়ির বোঝা রেখে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নামাযে অনুপস্থিত বা বে-নামাযীদেরকে তাদের গৃহসহ জ্বালিয়ে দিতাম।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঐ পবিত্র বাক্যটিতে এ বাণীই নিহিত রয়েছে যে, যারা ইবাদত পালন করে না তারা আগুনের ইন্ধন হবার পাত্র। মৃত্যুর পর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চাইতে এ দুনিয়াতেই তাদের জ্বলে পুড়ে যাওয়া শ্রেয়। এটাই এর অন্তর্নিহিত পয়গাম। **ইবাদতের সাথেই সর্বৈব নাজাত বিজড়িত। তাই ঐ সব লোক যারা আজ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদগুলোতে দলে দলে উপস্থিত হয়েছেন এবং যারা মসজিদে স্থান না পেয়ে রাস্তায় বসে আছেন তাদের সকলের নিকট আমার এই আওয়াজ পৌঁছুক, তাদেরকে আমি এই পয়গাম পৌঁছাতে চাই যে, আমাদের ইবাদত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের ইবাদত এবং প্রতিবার যখনই আযানের ধ্বনি উত্থিত হয় তখন মু'মিনের কর্তব্য, নিজের গৃহ ত্যাগ করে সেই মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া, যেখান থেকে ইবাদতের জন্যে আহ্বান করা হচ্ছে**।–"হাইয়া আলাস্ সলাহ্ (২বার), হাইয়া আলাল ফালাহ্ (২বার)–পাঁচ বেলা এই আহ্বান শ্রবণ করে থাক যে, "দেখ, নামাযের দিকে চলে এসো, নামাযের দিকে এসো। সফলতার দিকে ধাবিত হও।" তথাপি তাতে তোমরা সাড়া দাও না। যাদের পক্ষে মসজিদে যাওয়া সম্ভবপর, যাদের মসজিদে যাওয়ার তওফীক ও সামর্থ্য আছে– **তওফীকের ব্যাপারটি আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। কেউ-ই এ কথা বলতে পারে না যে, ওমুক ব্যক্তির তওফীক আছে, কি নেই। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে কেউ বলে, সে অসুস্থ ; এমনও রোগ-ব্যাধি আছে যা দেখা যায় না। এমতাবস্থায় মানুষের উচিত নিজের মুখ বন্ধ রাখা, সমালোচনায় বিরত থাকা। যদি কেউ বলে যে, সে অসুস্থ বিধায় নামাযে শামিল হতে পারে নি ইহা শুনার পর অন্যের পক্ষে এ কথাই বলা ও ভাবা উচিত যে, তাদের সকলের ব্যাপার আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখে। তবে অবশ্য প্রত্যেকে নিজেই জানে, সে সামর্থ্যবান কি না**। মোটকথা, যার সামর্থ্য ও তওফীক আছে প্রত্যেকেই যেন মসজিদে গিয়ে ইবাদত তথা নামায আদায় করে। যদি পাঁচ বেলা মসজিদে যেতে না পারে তাহলে যেখানেই তার তওফীক ও সামর্থ্যে কুলোয় সেখানকেই মসজিদস্বরূপ করে নেয়, অর্থাৎ সেখানেই যেন সে বাজামাত নামায পড়ে বা পড়ায় এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের একত্র করে নেয় যাতে তার নামায বা-জামাত আদায় হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, যার অন্তরে সর্বদা এই আগ্রহ ও উদ্বেগ থাকে যেন তার প্রতিটি নামায বা-জামাত আদায় হয়, তার জন্যে সুসংবাদ রয়েছে, যদি লোকজনসহ বাজামাত নামায আদায় সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ইরশাদ হলো ঐরূপ ব্যক্তি যদি আযান দিয়ে একাই বা-জামাত নামাযের নিয়্যতে দাঁড়ায়, তাহলে তার সঙ্গে কেউ যদি শামিল নাও হয়, আল্লাহ্‌তাআলা আকাশ থেকে

ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ করবেন। তারা তার সঙ্গে নামায় আদায় করবে। এইরূপে তার নামায বা-জামাত বলে গণ্য হবে। এই সেই বরকত যা প্রতিদিন পাঁচবার আপনাদের কাছে আসে কিন্তু উহা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়। আর সারা বছরে কেবল একবার যে একটি জুমুআতুল বিদা'র নামে আসে উহার সম্বন্ধে মনে করা হয় যে ইহাই সকল গোনাহ্‌ ক্ষমা করানোর দিন। কে জানে, কার কোন্‌ দিন মৃত্যু এসে যাবে। ইহাও তো চিন্তা করে দেখুন, এই জুমুআর দিনে গোনাহ্‌ ক্ষমা করিয়েই অব্যবহিত পরেই কি তোমরা মারা যাবে ? জুমআতুল বিদা'র সাথে গোনাহ্‌র ক্ষমা লাভের সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব-তথ্য কমপক্ষে আমি কোথাও পাই নি। ধরুন, যদি থাকেও তাহলে বছরের যে অবশিষ্ট দিনগুলো রয়েছে ৩৬৪ দিন, সেগুলোতে আজ্‌রাঈল কবেই বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে ? ইহা কি অবধারিত ও নিশ্চিত যে তোমরা এই জুমুআর দিন গোনাহ্‌ বখশিয়ে তার পরেই মৃত্যু বরণ করবে ? মৃত্যু তো অন্য কোন সময়ও আসতে পারে। এর কোনও দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্তের নামায এজন্যেই আসে যাতে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও পাক-পবিত্র অবস্থায় এ ধরাধাম থেকে যেতে সক্ষম হও। অতএব, এই উপলক্ষে এবং এ সুযোগটিতে আমি জামাতকে নামায বা-জামাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর তেমনি ঐ সকল মুসলমান ভাই যারা টেলিভিশনের মাধ্যমে আমাদের জুমুআর খুতবা শ্রবণে শামিল হচ্ছেন (এবং খুতবা শোনার এই প্রবণতা দৈনন্দিন আল্লাহ্‌র ফযলে বেড়ে চলেছে)–তাদেরকেও আমি উপদেশ দান করছি যে, আপনারা নিজেরাও এই দিকে মনোযোগী হোন এবং অন্যান্য ভাইদেরকেও মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করুন। এই পয়গাম তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিন যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায কায়েম করাই হচ্ছে ধর্মের সকল শিক্ষা ও অনুশাসনের প্রাণবস্তু। যদি তাদের মধ্যে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এর ফলে পৃথিবীময় মুসলমানদের মধ্যে এরূপ সংশোধন-প্রক্রিয়া সচল ও সক্রিয় হয়ে পড়বে, যদ্বারা ইসলাম ইহার হৃত গৌরব ও পার্থিব শান-মর্যাদারও অধিকারী হয়ে যাবে। কেননা, বাহ্যিক শান ও মর্যাদার প্রকৃত সম্পর্ক আধ্যাত্মিক শান ও মর্যাদার সাথেই বিজড়িত। যদি সত্যিকারভাবে অভ্যন্তরীণ (আধ্যাত্মিক) উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহলে বাহ্যিক (পার্থিব) শান ও মর্যাদা অবশ্যম্ভাবী। **যদি অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে বাহ্যিক শান ও মর্যাদার পিছনে আপনারা যতই ধাবিত হোন না কেন, উহা আসলে অন্তঃসারশূন্য হবে** এবং খোদাতাআলার দৃষ্টিতে উহার কোনও মূল্য হবে না। অতএব নিজেদের অভ্যন্তরকে সুশোভিত করুন, আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের দিকে ধাবিত হোন। আল্লাহ্‌তাআলা সেই মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দান করুন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা নিজে বলেন ঃ – তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং সর্বাপেক্ষা মহান সেই ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী (খোদা-ভীরু)। **অতএব, তাকওয়ার দাবি ও চাহিদা ইবাদত ব্যতীত পুরা হ'তে পারে না। আমি আশা রাখি, এইরূপে আপনারা মনোযোগী হবেন।** জুমুআর দিনের বরকতের যে উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি হাদীস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি ঃ

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন – (এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ লুবাদা বিন আবুল মুনযের এবং সুনান ইবনে মাজার 'বাব ফি ফাযলিল জুমুআ' হতে উদ্ধৃত)– আবূ লুবাদা বল্‌ছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "জুমুআ সকল দিবসের সরদার (সেরা) এবং আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে এর অশেষ মাহাত্ম্য। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ দিনটি ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আযহিয়ার দিনগুলোর চাইতেও মাহাত্ম্যপূর্ণ।"

এখানেও সে একই কথা পরিলক্ষিত হচ্ছে যদিও জুমুআ ব্যতীত দুই ঈদেরও অতীব মাহাত্ম্য রয়েছে কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) বলছেন, আল্লাহ্‌র কাছে দুই ঈদের চাইতেও জুমুআর মর্যাদা হচ্ছে অধিকতর ও উচ্চতর। এতে রয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ঃ (১) আল্লাহ্‌তাআলা এই দিনে হযরত আদমকে পয়দা করেন, (২) তাকে তিনি এই দিনেই পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করেন অর্থাৎ এই দিনেই তাঁর রূহানী উন্মেষ ঘটে এবং পূর্ণতা লাভ হয় (৩) এই দিনেই মৃত্যু বরণ করেন। যেমন হযরত ঈসা মসীহ্‌র (আঃ) সম্পর্কে কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ (– আমার উপর শান্তি– যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি ও যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে উত্থিত করা হবে)। এই একই অবস্থা ছিল আদমের (আঃ)। এবং কুরআন করীমে আদমের সাথে ঈসার সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসটির দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে ঐ সমুদয় বিষয়গুলোও প্রযোজ্য। হযরত ঈসা যিনি প্রথম আদমের সদৃশ বলে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর জন্মের দিনটিও বরকতময় ছিল এবং তার মৃত্যুর দিনটিও। তাঁর পুনরুত্থানও অনুরূপ হবে। তবে এখানে পরকালে তাঁর উত্থিত হবার তো উল্লেখ নেই। উল্লেখ রয়েছে, তিনি 'মাবউস' অর্থাৎ উত্থিত বা আবির্ভূত হবেন। বস্তুত যিনি ইহলোকে উত্থিত হন তিনি পরকালেও অনুরূপ কল্যাণ ও বরকতের সাথে পুনরুত্থিত হবেন।

চতুর্থ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, এই দিন (শুক্রবার) বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে যা চায় তাই দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় সম্বন্ধে প্রার্থনা করে। জুমুআর দিনে এরূপ এক মুহূর্তটিতে খোদাতাআলার দিক থেকে কোনও কিছু অস্বীকার বা রদ করা হয় না। তবে অবশ্য হারাম বিষয়ের জন্যে আবদার তথা দোয়াকে রদ করা হয়। অতএব যদি তোমাদের দোয়া নেক (বৈধ ও কল্যাণকর) বিষয়ে হয়, তাহলে তোমাদের ঐ দোয়া কবুল করা হবে। আর এই কবুলিয়তের ওয়াদা ও আহ্বান ঐ সব লোকের জন্যই, যারা জুমুআর গুরুত্বকে অনুধাবন করে, সদা সর্বদা চেষ্টিত থাকে যেন তারা জুমুআর হক্‌ আদায় করতে সক্ষম হয় এবং এই পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করে। এ কথাটি আমি বিশেষভাবে ইউরোপবাসীর উদ্দেশ্যে বলছি যেখানে জুমুআর দিনটি দৈনন্দিন কাজের দিন। পূর্বেও আমি জুমুআর বিষয়ে বিশেষভাবে উপদেশ (এক বিশেষ 'তাহরীক' বা আহ্বান -স্বরূপ) প্রদান করেছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে এটুকু চেষ্টা আপনারা অবশ্যই করবেন যেন পর্যায়ক্রমে (লাগাতার) তিন জুমুআর বিরতি না হতে দেন। কেননা, আঁ হযরত (সঃ) তিন জুমুআ একত্রে (লাগাতার) বিরতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কাজেই যদি নিজেদের ঈমানের হেফাযত আপনাদের কাম্য হয় তা হলে প্রথমতঃ প্রত্যেক জুমুআর নামাযই পড়া উচিত। যদি পড়তে না পারেন, তাহলে

তিনটির মধ্যে একটি জুমুআ তো অবশ্য অবশ্যই পড়ুন যদিও কর্মস্থল থেকে ছুটি নিতে হয়। উক্ত 'তাহরীক' আমি করেছিলাম। পরবর্তীতে আমি জানতে পারি, জামাতের মধ্যে এমন বিপুল সংখ্যক লোক রয়েছেন যারা ঐ তাহরীকে সাড়া দিয়েছিলেন। যার ফলে আল্লাহ্‌তাআলা তাদের পথ সহজ ও সুগম করে দেন। এরূপ বহু ছাত্রছাত্রী ছিল যারা তাদের শিক্ষকদের কাছে গিয়ে ঐ বিষয়টি পেশ করে। শিক্ষকরা তাদের কথা মেনে নেন। যাদের দাবী গৃহীত হয় নি তাদের মা-বাবারা বলেন, "কমপক্ষে একটি জুমুআয় তো আমরা আমাদের সন্তানদেরকে অবশ্যই নিয়ে যাব।" তারা তদ্রূপ করেও দেখান। কিছু সংখ্যক এরূপ নিষ্ঠাবানও ছিলেন, যাঁরা ঐ সব চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন যেগুলিতে তাদের জন্যে জুমুআর জন্য কাজ থেকে বিরতির অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌তাআলাই তাদের উত্তম উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন। ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বরকত,যা প্রত্যেক জুমুআর সাথেই সম্পৃক্ত। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, জুমআর অন্যতম বরকত এই যে, ইহাতে এরূপ মুহূর্ত আসে যখন খোদাতাআলার পক্ষ থেকে (কবুলিয়তের ক্ষেত্রে) অস্বীকৃতি থাকে না, কেবল হারাম কাজের প্রার্থনা ব্যতীত, অর্থাৎ খোদার সমীপে এই প্রার্থনা যে, তাকে তার প্রার্থিত কোন নিষিদ্ধ কাজ করতে দেয়া হোক। তিনি (সঃ) আরও বলেছেন, "জুমুআর দিনেই শাফাআত প্রতিষ্ঠিত হবে।" ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। আঁ হযরত (সঃ) -কে আল্লাহ্‌তাআলা "শফীউল-মুযনেবীন" (গোনাহ্‌গারদের শাফাআতকারী) বানিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ সকল গোনাহ্‌গার যাদের মধ্যে দুর্বলতা ও ক্রটি রয়ে গেছে-তারা চেষ্টা তো করেছে যাতে তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নত অনুযায়ী পরিচালিত হয় কিন্তু কোন কোন প্রতিবন্ধকতা বা বাধ্যবাধকতা এরূপ ছিল যেগুলোর ফলশ্রুতিতে তাদের 'আমলনামা' (কর্মলিপি) সেই মার্গ থেকে নিম্ন স্তরে থেকে যায়, যেখানে পৌঁছার পর নাজাত লাভ হয়। অন্য কথায়, তাদের ক্রটিসমূহ তাদের নেকী ও গুণাবলীর তুলনায় কিছুটা বেশী থাকে। এ শ্রেণীর লোকও থাকে। এইরূপ লোকদের পক্ষে আঁ হযরত (সঃ) এক বিশিষ্ট মর্তবা ও মর্যাদা প্রদত্ত হয়েছেন। কাজেই তিনি (সঃ) বলেন যে, "জুমুআর দিন শাফাআত কায়েম হবে। এমন কোন ফিরিশ্‌তা, পাহাড় বা বায়ুমন্ডলী বা সমুদ্র নেই যা জুমুআর দিনের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত নয়।" এই যাবতীয় মাহাত্ম্য আঁ হযরত (সঃ) জুমুআ প্রসঙ্গে বলেছেন। কাজেই শাফাআতের জন্যেও আবশ্যকীয়, জুমুআর সাথে সম্পর্ক ঘনীভূত ও নিবিড় হওয়া। কেননা শাফাআতের উদ্দেশ্য হলো, একটি জিনিস যা মধ্যখান দিয়ে ভেঙ্গে গেছে উহাকে জোড়া দেয়া। এক ব্যক্তি নাজাত পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে একটুর জন্য পারে নি-কিছুটা ব্যবধান মধ্যে রয়ে গেছে-সেক্ষেত্রে তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার রশিকে সেখান থেকে ধরে শাফাআতের দ্বারা নাজাতের মাকামের সাথে জোড়া দিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ নাজাতের উচ্চস্তর হতে যখন সে দু'চার হাত দূরে থেকে যায় এবং তার শক্তি জবাব দিয়ে দেয়, ফলে সে পৌঁছুতে পারে না, তখন উহার থেকে একটি হাত নেমে আসে যা তাকে উপরে (নাজাতের ঈপ্সিত স্তরে) তুলে দেয়। ইহাই হচ্ছে শাফাআত। **কাজেই যে ব্যক্তি জুমুআতে উপস্থিত হবে সে-ই শাফাআত লাভ করতে পারবে। কেননা শাফাআত জুমুআর দিনেই বিতরণ করা হবে। যারা জুমআয় অনুপস্থিত থাকে তারা তো জানেই না, শাফাআত কি বিষয়।** অতএব, যারা শাফাআত লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাদের পক্ষে আরও আবশ্যক যেন জুমুআর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। অতঃপর আঁ হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, জুমুআ (শুক্রবার) হচ্ছে সেই দিন যাকে আল্লাহ্‌র সকল নৈকট্য-প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তারাও ভয় করে- এমন কি বায়ু মন্ডল, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রও। এর কী কারণ ? এ দিনটিতে সেরূপ কী আতঙ্ক ও বিভীষিকা পরিলক্ষিত হয় যার কারণে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় ? এস্থলে প্রকৃতপক্ষে ভীতি শব্দ সম্মানের অর্থে বলা হয়েছে। এদিনটির মর্যাদা এতই যে, এদিনের যথার্থ মর্যাদার ব্যাপারে তারা ভীত থাকে। এর দ্বারা ইহাই বুঝায়। অন্যথায়, এর কোনও অর্থ দাঁড়ায় না। এক দিকে বরকত ও কল্যাণাবলীর কথা বর্ণিত হচ্ছে, আকৃষ্ট করা হচ্ছে এবং লোকদের আহ্বান জানান হচ্ছে, 'এসো, এদিনের বরকত লাভ কর।' আর অন্য দিকে ঘোষণা দেয়া হয় যে ইহা ভয়াবহ ও মারাত্মক দিন। সাবধান, বড় বড় নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তারাও এ দিনকে ভয় পায়, পর্বতমালাও ভয় পায়, সমুদ্ররাশিও এ দিনকে ভয় পায়, পৃথিবীর চরাচরও ভয় পায়। এই ঘোষণাটি এ অর্থ ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ বহন করে না যে, দিনটির মাহাত্ম্য ও মর্যাদার প্রতি তারা ভীত-ত্রস্ত। এদিনকে যেহেতু সম্মানিত ও মর্যাদা-মন্ডিত করা হয়েছে, তাই উহাকে তারা অত্যন্ত সমীহ করে। অর্থাৎ এমন না হয় যেন তারা এদিনটির দাবী ও চাহিদা মিটাতে অক্ষম হয়-এ বিষয়ে তারা ভীত থাকে। এর মানে এই যে, নৈকট্য-প্রাপ্তদের যেখানে ভয় রয়েছে, এ দিনের মর্যাদা রক্ষার তওফীক তারা লাভ করতে পারে কিনা, সেখানে সর্বসাধারণ মুসলমানদের তো আরও অনেক ভয় করা উচিত। কেননা তাদের পক্ষে তো এ দিনটির দাবী ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভবপর বলেই প্রতীয়মান হয় না বরং সাধ্যাতীত বলে পরিলক্ষিত হয়। অতএব, ইহার তওফীকও আল্লাহ্‌তাআলার ফযলের দ্বারাই প্রদান করা হয়। যদি আপনারা অবিরাম দোয়া করতে থাকেন এবং এ বিষয়-বস্তু তথা জুমুআর মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা অবশ্য সাহায্য করবেন। সকল প্রকার তওফীক তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, "জুমুআতুল বিদার দিন যে ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সব নামায একসাথে আদায় করে, যাতে তার কাযা নামাযের প্রতিকার হয়ে যায়, তার এরূপ করার কোন বৈধতা আছে কি না ?" এই ছিল প্রশ্ন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, " ইহা একটা বৃথা ও বেহুদা কাজ।" তবে একবার এক ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ছিল ! তার সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি হযরত আলীকে (রাঃ) বল্‌ল, 'আপনি হলেন যুগ-খলীফা। আপনি তাকে কেন নিষেধ করেন না ?' তিনি প্রত্যুত্তরে বল্‌লেন, "এজন্যে নিষেধ করি না যে, আমি যেন এ আয়াতের অধীনে অপরাধী সাব্যস্ত না হই, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ...... -"তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখ নি, যে খোদাতাআলার বান্দাকে বাধা দেয় যখন সে নামায পড়ে ?"

অতএব, তিনি ঐ নামাযকে সমর্থন করে কোন মন্তব্য করেন নি, যা সে পড়ছিল। ইহা বলেন নি যে, তাকে ঐ রূপ করতে দাও ; সে ঠিকই

করছে, আর তাই যারা সারা জীবনের 'কাযা' (পরিত্যক্ত নামায) পড়ে, তারাও ঠিক কাজ করে। পরন্তু তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায আদায় করছে তাকে আমি নিষেধ করতে পারি না– এরূপ করার দুঃসাহস আমার নেই।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, " তবে যদি কোন ব্যক্তি, যে 'কাযা' নামায পড়ছে, সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ইহা মনে করে নামায পরিত্যাগ করে থাকে যে, 'কাযা-এ-ওমরী' (সারা জীবনের পরিত্যক্ত নামায একত্রে আদায়)-স্বরূপ পড়ে নিবে, সে অবশ্যই না-জায়েয করেছে। তবে যদি সে লজ্জাবোধ ও অনুশোচনার কারণে ভুলের প্রতিকার হিসেবে মনে করে ঐরূপ করে থাকে তাহলে তাকে তা করতে দাও।" যদি সে লজ্জিত হয়ে থাকে, অনেক দেরীতে তার অনুভূতি হয়ে থাকে এবং সে মনে করছে যে, তার এত দিনে হু'শ হয়েছে যখন সে জীবনের এতটা অংশ নষ্ট করে দিয়েছে এবং যে নামাযগুলো সে পড়ে নি (কাযা করেছে), ঐ সবগুলো নামায যেন কোনওক্রমে পড়া হয়, এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, লজ্জা ও অনুতাপের অধীনে যদি ঐ ব্যক্তি নামায পড়ে থাকে তাহলে তাকে পড়তে দাও যাতে আল্লাহ্ তার অনুশোচনাকে কবুল করে নেন, তাই ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। আমাদের কাজ নয় তাকে নিষেধ করা বা বাধা দেয়া। তিনি বলছেন, তাকে কেন নিষেধ করতে যাবে ? যাই হোক সে দোয়াই তো করছে। তবে ইহা তার সাহস ও উদ্যমের অভাব বশতই বটে। ইহা কোন শুভ কাজ নয়, বরং যেসব নামায নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে আদায় করা দরকার ছিল সেসব নামায তো সে হারিয়ে ফেলেছে এবং পরে অনেক দেরীতে লজ্জা বোধ করছে, যখন সময় পার হয়ে গেছে। তারপর তিনি (আঃ) বলছেন, "নিষেধ করে তোমরা নিজেরা যেন আবার সেই আয়াতের আওতায় এসে না পড়, যে আয়াতের উল্লেখ হযরত আলী (রাঃ) করেছিলেন।" অতএব, কোন ব্যক্তি নেক কাজ শুদ্ধভাবে করুক কিংবা অশুদ্ধভাবে, উচিত কি অনুচিতভাবে করুক তা থেকে তাকে বাধা দানে বিরত থাকা উচিত। সে করে সারার পর তাকে বোঝানোর চেষ্টা অবশ্য করা উচিত।

রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ঐশী নিদর্শন ঃ

এতো ছিল জুমুআতুল বিদা' প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য বিষয়-বস্তু। কিন্তু আজ জুমুআর দিনটির এরূপ কতগুলো বরকত আছে যার সম্পর্ক কেবল সমগ্র বিশ্বের সাথেই জড়িত নয়, বরং প্রত্যেক যুগ ও সময়কালের সাথেও বিজড়িত। আর এগুলো হচ্ছে ঐসব বরকত, যা 'আখারীন'কে (পরবর্তী অন্যদেরকে) 'আওয়ালীনে'র (পূর্ববর্তীদের) সাথে মিলিত করার কারণ। এইসব হচ্ছে ঐ সকল বরকত যার মধ্য দিয়ে আজ আমরা অতিক্রম করছি। এই জুমুআর দিনটি জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে এক বিশেষ বরকতমন্ডিত দিন। নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিটি জুমুআ তো অবশ্য বরকতপূর্ণ হয়েই থাকে, কিন্তু আজকের জুমুআর দিনটি এরূপ এক দিন, যার বরকত ও মাহাত্ম্য বাস্তব ইতিহাসের দ্বারা সপ্রমাণিত। খোদাতাআলার যে সুন্নত (অবধারিত নিয়ম) এ যুগে জারী হয়েছে উহার দ্বারা সাব্যস্ত। তা এইরূপে যে, হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী এ বিষয়ের আলামত (প্রামাণ্য চিহ্নস্বরূপ) ছিল যে, সেই মাহ্দী যার সপক্ষে আকাশ উজ্জ্বল সাক্ষ্য দান করবে, তাঁর সেই জামাত হবে যাদের সম্পর্কে কুরআন করীমে উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় ঃ **ওয়া আখারীন মিনহুম লাম্মা ইয়াল্‌হাকু বিহিম"** –"ওরা হবে ঐ সকল লোক যারা পরবর্তীকালে আসবে– যারা এখনও সাহাবাদের সাথে মিলিত হ'তে পারে নি, কিন্তু সাহাবাদের সাথে তারা মিলিত হয়ে যাবে।" এই হচ্ছে তাদের সম্বন্ধে সুসংবাদ। তদ্ব্যতীত, যে মহাপুরুষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাঁর সপক্ষে (তার সত্যতার সমর্থনে) আকাশের দু'টি সাক্ষ্য অবধারিত ছিল। সেই সাক্ষ্য দু'টি এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রদত্ত হলো। এই ঘটনা এইরূপে ঘটেছে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন দাবী করলেন যে, তিনিই সেই মাহ্দী যিনি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মাহ্দী, তখন সকলের দৃষ্টি ঐ আসমানী নিদর্শন দেখার জন্যে আকাশের দিকে নিবদ্ধ হলো এবং উলামাদের পক্ষ থেকে তীব্র দাবী উত্থাপিত হতে লাগলো, "যদি তুমিই সেই মাহ্দী হয়ে থাক, তাহলে ঐ নিদর্শন তো দেখাও। আকাশের সেই দু'টি সাক্ষ্য তো প্রদর্শন কর যা ইমাম মাহ্দীর সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যে নির্ধারিত ছিল।" সে দু'টি আসমানী সাক্ষ্য ও নিদর্শন কী ছিল ? তার জন্যে আমি ঐ হাদীসটি পাঠ করে আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি ঃ "ইন্না লি মাহ্দী ইয়ে না আয়া তাইনি লাম তাকুনা মুনযু খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরয ইয়ানকাসিফুল কামারু লি আওয়াওয়ালি লাইলাতিম্ মির রামাযানা ওয়া তানখাসিফুশ্ শাম্‌সু লিন্নিসফিম্ মিনহু, লাম তাকুনা মুনযু খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌য।" "আমাদের মাহ্দীর জন্যে দু'টি নিদর্শন আছে। সৈয়্যদনা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ বলেছেন যে, সে আমাদের (তথা তাঁর ও তাঁর উম্মতের) মাহ্দী হবে। আমাদের সাথে তার যে সম্পর্ক তা তোমরা কখনও ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না। তার সপক্ষে আকাশ সাক্ষ্য দিবে,–চন্দ্রের এবং সূর্যের গ্রহণ হবে। রমযানে ঘটনা দু'টি সংঘটিত হবে। কে আছে, যে তাকে আমাদের থেকে সম্পর্কচ্যুত করতে পারে ? কেননা সে তো আমাদের মাহ্দী নিশ্চয় সে আমাদেরই মাহ্দী" কত প্রেমভরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ ছিল এই যে, চাঁদের গ্রহণ লাগবে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে নির্ধারিত তিনটি তারিখের মধ্যে প্রথমটিতে অর্থাৎ রমযান মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্যগ্রহণ হবে উহার গ্রহণের তিনটি তারিখের মধ্যবর্তী অর্থাৎ ২৮ তারিখে। এই ঘটনা ঘটবে পবিত্র রমযান মাসে। এবং এর পূর্বেই ইমাম মাহ্দীর দাবীদার আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। ইহা এরূপ এক নিদর্শন, যা আল্লাহ্‌র কোনও প্রেরিত পুরুষ কখনও নিজের সত্যতার স্বপক্ষে পেশ করেন নি। "লাম্‌তাকুনা মুনযো খাল্‌কিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আর্‌য"-"এরূপ নিদর্শন অন্য কোনও প্রেরিত পুরুষের সত্যতার নিদর্শনরূপে সংঘটিত হয় নি।" এই হচ্ছে সেই প্রেক্ষাপট। ইহা আপনারা দৃষ্টিপটে রাখুন।

দৈনিক আল্ ফযলে এ সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী এক সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধকার ছিলেন জনাব আযম আকসীর সাহেব। তিনি ঘটনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর কিছু দিন পরেই উলামা দাবী উত্থাপন করছিলেন, সাধারণভাবেও তুমুল রব উঠেছিল, " চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হলে তো আমরা জানতে পারব যে, সে সত্য মাহ্দী।" তখন ১৮৯৪ ইং সালে 'রমযানুল-মুবারকে ১৩ তারিকে চন্দ্র-গ্রহণ সংঘটিত হলো। ইহাতে সর্বসাধারণ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কিছুটা প্রত্যাশা ও প্রত্যয় জেগে উঠলো। আর এক শ্রেণীর লোক কষ্ট অনুভব করতে লাগলো। তাদের বদদোয়াকে তারা সতেজ করলো। তাদের অন্তরে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হলো, "

এমন না হোক যে রমযান মাসে একজন মাহ্দীর দাবীদারের সপক্ষে যেমন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে, এরপর সূর্যও অনুরূপ সাক্ষ্য না দিয়ে বসে। যদি তাই ঘটে যায় তাহলে আমরা (মানুষদের) কী জবাব দিব ?" অনেক দূর-দূরান্তে অবস্থিত আহ্মদীদের মধ্যে আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবাসস্থল কাদিয়ানে গিয়ে তাঁর সাথে একসঙ্গে সেই গ্রহণটি অবলোকন করার। তাদের নিশ্চিৎ বিশ্বাস ছিল যে, ২৮ তারিখে সূর্য গ্রহণ না হয়ে পারে না। সুতরাং তিনজন অনুরূপ মুসাফিরের কথা আ'যম আকসীর সাহেব তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। মির্যা আব্দুর রহীম বেগ সাহেব একটি স্টেটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তার দুই পুত্র এবং তাদের এক বন্ধু –যারা ছাত্র ছিল, তাদের এই কাফিলা লাহোর থেকে কাদিয়ান রওয়ানা হলো এবং সূর্যগ্রহণ যে তারিখে লাগার প্রত্যাশা ছিল অর্থাৎ ২৮ তারিখে, তার একদিন পূর্বে তড়িঘড়ি করে ঝটিকা সফর করে তারা বাটালা পৌঁছলেন, যাতে পরের দিন সেখান থেকে তারা ভোর হতে হতে কাদিয়ানে পৌছতে পারেন। কিন্তু কোন টমটম বা রিক্সা বাটালা থেকে কাদিয়ান যেতে রাজী হলো না। এর ফলে নিরূপায় হয়ে ঐ বেচারীরা পদব্রজেই রওয়ানা হয়ে পড়লেন এবং সেহরীর সময় গিয়ে তারা কাদিয়ান পৌঁছলেন। এইরূপে আহমদীদের মনে সাধারণভাবেই এক প্রবণতা ও আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়ে যায়, তারা যেন বিশেষভাবে ঐ দিনটি কাদিয়ানে অতিবাহিত করতে এবং স্বচক্ষে নিদর্শনটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এরপর দেখুন, খোদাতাআলার কী শান ! কীরূপে তিনি ঐ আশা - আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূরা করলেন এবং কীরূপে নিদর্শন দেখালেন ! সে দিনই (২৮শে রমযান ১৮৯৪ ইং) সকালে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। ৯টার সময়ই সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল। আর গ্রহণ শুরু হতেই নামায-এ-কসূফ-খসূফও শুরু হলো। তাদের অন্তরের যে কী অবস্থা হচ্ছিল তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনা ! তেরশ' বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, "আমাদের মাহ্দীর জন্যে আসমান দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করবে।" একটি সাক্ষ্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অপরটির উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ঐ দিন কাদিয়ানে তারা তদ্রূপই দৃশ্য দেখতেও পেলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অবিকল তাই ঘটলো যেরূপ বলা হয়েছিল।

শুরুতে ঐ সূর্যগ্রহণটি কিছুটা হাল্কা ছিল। ইহাতে কয়েকজন সাহাবা বলতে লাগলেন, "গ্রহণ তো হাল্কা ধরনের হয়েছে। এমন না হোক যে, মৌলবীরা বলতে পারে, গ্রহণ হয়-ই নি। ওটা তোমাদের চোখের ধোঁকা বৈ অন্য কিছু নয়।" কিন্তু এ দিকে যখন এসব কথা-বার্তা হচ্ছিল তখন আকাশে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ ঘটে গেল। এবং ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই বিস্ময়াতীত দৃশ্য সবাই দেখলেন। ইহা সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যা পূর্ণ হয়ে আজ এক শ' বছর গত হয়েছে।

আজ এ রমযান এক শ' বছর পর আবার ঘুরে এসেছে এবং ঐ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের এক ঝলক নিদর্শন আমাদেরকেও দেখাচ্ছে। অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, শুক্রবার দিনটি এক বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তা এভাবে যে, তখন যে চন্দ্র-গ্রহণ হয়েছিল রমযান মাসে উহা বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর ১৩ তারিখের শুক্রবারের রাত শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অর্থাৎ আমি বলতে চাই, গ্রহণের ইতিহাস এই দাঁড়িয়েছে যে, ১৮৯৪ সনের রমযানের ১৩ তারিখটি যখন আমাদের এবারের রমযান মাসে আসলো (অর্থাৎ এবারের ১৩ তারিখও) বৃহস্পতিবার দিন শেষে সূর্যাস্তের পর শুক্রবারের রাতে আমরা একশ' বছরের পূর্তি উদযাপন করি। আর আজ (২৮শে রমযান) যে সূর্য গ্রহণের তারিখ ইহাও শুক্রবারে পড়েছে। কাজেই সেই শুক্রবার, যা জামাত আহমদীয়ার জন্যে বরকতের কারণস্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। যে শুক্রবার বার বার ভরে ভরে বরকত ও আশিস আমাদের উপর ঢালতে থাকে। এ সেই শুক্রবার, যার সাথে আমাদের প্রভূত কল্যাণ বিজড়িত। তাই আহমদীয়া জামাত যদি জুমুআর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা রক্ষা না করে, তাহলে বড়ই দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। ইহা সেই 'সূরা জুমুআ'ই তো 'আখারীন'কে 'আওওয়ালীনে'র সাথে মিলাবার সুসংবাদ দিয়েছে। উহারই সংশ্লিষ্ট প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ আমি খুতবার শুরুতে তেলাওয়াত করেছি। উহার শেষ ভাগে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ .... "যালিকা ফায্লুল্লাহি ইউতীহিমাই ইয়াশাউ ওয়াল্লাহু যুল ফায্লিল্ আযীম" – ইহা তো আল্লাহ্র ফযল ও কৃপা ! কে আছে যে এই ফযলকে (ঐশী কৃপাকে) রোধ করতে পারে ? তিনি যাকে চান তাকেই ইহা দান করেন এবং বড়ই ফযলের অধিকারী তিনি।" কাজেই এ 'সূরা জুমুআ'ই তা আগন্তুকদেরকে (আখারীনকে) সুসংবাদ দিয়েছে। এরা বড়ই সৌভাগ্যশালী আগন্তুক। তারা পরে অর্থাৎ শেষ যুগে আসা সত্ত্বেও আওওয়ালীন'দের সাথে মিলিত হবে। এদের সপক্ষেই আকাশ এই দু'টি সাক্ষ্য পেশ করেছে। **কাজেই আমরা এরূপ যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি, যখন ঐ সকল বরকত ও আশিস যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে, আমরা সে একই যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতঃ ঐ সব বরকত ও আশিসের স্মরণে মাতোয়ারা হয়ে এগিয়ে চলেছি। ইহা এক কল্পনাতীত অবস্থা। আজ আমি চিন্তা করছিলাম, ঐ যে কাফিররা বলতো ঃ "সিহ্রিম্ মুস্তামির" "এতো নিরবচ্ছিন্ন এক যাদু, যা পশ্চাদ্ধাবন করেই চলেছে, যা পিছন ছাড়ছে না।" বস্তুত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর যে বরকতের বারিধারা বর্ষিত হয়েছিল উহাও তো এক যাদুর মতই দৃশ্য বা প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেছে। এখন ঐসব ধারাবাহিক বরকতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে মনে হয় যেন আমরা যাদু ছোঁয়া জীবনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছি।** তবে তাদের অবস্থা কীরূপ হবে যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে দেখেছেন! তাঁর প্রেমে বিভোর হয়েছেন। মনে হয় যেন সবকিছুই বিসর্জন দিয়ে তারা মসীহ মাওউদ (আঃ)-এরই হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সত্যের পয়গামকে তারা বিশ্বময় ছড়িয়েছেন। উহাকে সর্বত্র পৌঁছিয়েছেন।

'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'র আবেগময় আহ্বান ঃ

বর্তমানে আমি যখন আপনাদেরকে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'র দিকে পুনরায় আহ্বান জানাচ্ছি, আমি আপনাদের স্মরণ করাতে চাই যে, এমনতর দিনেই দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এরকম দিনগুলোতেই ইহার সূচনা হয়েছিল। তাঁরা (সাহাবারা) আত্মহারা হয়ে মদমত্ততার ন্যায় এক আত্মবিভোর অবস্থায় জগতের নিকট সত্যের পয়গাম পৌছিয়েছিলেন। এক বিস্ময়কর অবস্থা! যখন কোনও মুরব্বী ও মুবাল্লেগীনের নেযাম জারী ছিল না। তখন মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ঐ সাহাবীরাই ছিলেন যাঁদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর এবং অধিকাংশই অল্প শিক্ষিত ছিলেন। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত এবং বড়

বড় উলামাও ছিলেন। কিন্তু বাহ্যতঃ জাহেল ছিলেন কি আলেম, তাদেরকে অন্তঃকরণের দিক দিয়ে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছিল। রূহানী উলুমের (আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) দ্বারা তাদের অন্তঃকরণকে ভরে দেয়া হয়েছিল। বাহ্যিকভাবে ছোট কি বড়, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত –তাদের সকলেই আত্মবিভোর হয়ে তবলীগের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে জামাতসমূহ কায়েম হয়। খুবই তীব্র বিরোধিতা ছিল, যা আপনারা আজ কল্পনাও করতে পারেন না। বর্তমান কাজের সকল বিরোধিতা একদিকে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর প্রারম্ভিককালে এমনকি তার পরেও যে বিরোধিতা তারা দেখেছিলেন উহার সাথে অন্য কোনও সময়ের বিরোধিতার কোন তুলনা হতে পারে না। দিন-রাত সমগ্র ভারতবর্ষের উলামা, এমনকি আরব দেশ পর্যন্ত উলামা অশ্লীল গালমন্দ এবং আহমদীদের জান-মাল হালাল করার ফতোয়া দিতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। এদের প্রাণ হরণ বৈধ, এদের মাল লুণ্ঠন বৈধ, এদের স্ত্রীদের তালাক হয়ে গেছে। মোটকথা, এদের কোন কিছুই আর থাকলো না। যেমন ইচ্ছা তেমন তাদের সম্মান-সম্ভ্রম ও সম্পদের উপর হাত চালাও। তাহলে তোমরা খোদার হুযূরে মকবুল (গৃহীত) সাব্যস্ত হবে। (এই ছিল তাদের ফতওয়া এবং জনগণকে দিয়ে সেই অনুযায়ী অত্যাচারের কার্যকর পদক্ষেপ)। এই ছিল সেই যুগ যখন সাহাবাদের জামাত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পশ্চাদানুসরণে রওয়ানা হয় এবং তাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ খোদার ফযলে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকেই উঠে। এই জামাতের কদম থেমে যায় এরূপ একটি মুহূর্তও আসে নি। কাজেই খোদাতাআলা যখন এই বরকতসমূহের স্মৃতি ও স্মরণের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছেন এবং ঐ সকল অবস্থা (আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি) আমাদের অন্তঃকরণে সৃষ্টি করছেন, যা ঐ যুগে সাহাবাদের অন্তঃকরণে করেছিলেন এবং শত বছরের বরকতে ভরপুর ঐ যুগের মধ্য দিয়ে আমরা পুনরায় অতিক্রম করছি, তখন সেই জযবা ও অনুপ্রেরণা থেকেই আমি আপনাদেরকে 'দাওয়াত-ইলাল্লাহ্'র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। কোনও পরোয়া করবেন না। দুশমন যত ইচ্ছা তত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করুক না কেন। তারা তাদের অন্তরে যত দুঃখ-যন্ত্রণাই অনুভব করুক না কেন। দুশমনের মনের দুঃখ-যন্ত্রণা-ক্রোধ আপনাদের আনন্দ ও উৎফুল্লতাকে আপনাদের অন্তর থেকে কখনও কেড়ে নিতে পারবে না।

পাকিস্তানী সরকারের অন্যায়-অবিচার ও অত্যাচারমূলক আচরণ ঃ

পাকিস্তানী সরকার প্রথমতঃ কোনও আইন-কানুন ব্যতিরেকেই ঐ মযলুমদের উপর হস্তক্ষেপ করে বসলো। যারা আনন্দিত হচ্ছিল এই জন্য যে, একশ' বছর পর আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে পুনরায় ঐ দিনগুলো দেখালেন, যখন চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিলো, তাদেরকে জেল-হাজতে দেয়া হ'ল। কারাবন্দী করা হ'ল। তাদেরকে টানা-হেঁচড়া করা হ'ল। গাল-মন্দ দেয়া হ'ল। প্রহার করা হ'ল। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো হল। পত্তোকি, লাহোর, রাবওয়ায় কী না করা হয়েছে ! আরও বিভিন্ন জায়গায় এই সব অত্যাচারের ঘটনা রয়েছে। তবে তাদের এইসব অপচেষ্টার পেছনে মতলবটা কী ? আহমদীদের উপর আল্লাহ্‌তাআলার ফযল ও কৃপা বর্ষণের কারণে তারা যে আনন্দবোধ করছে, সে আনন্দ তারা কেড়ে নিতে চায়। এটাই তাদের চেষ্টা। কিন্তু এসব অপচেষ্টার দ্বারা আহমদীদের এহেন আনন্দকে কেড়ে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের অন্তর থেকে এই আনন্দ মুছে ফেলা যেমন আমাদের সাধ্যাতীত। তেমনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ ক্রোধ ও আক্রোশের যে আগুন জ্বলছে তা প্রশমিত হওয়া তাদের সাধ্যাতীত। না তাদের পক্ষে সম্ভব, না আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমরা উভয়ই নিরূপায়। একমাত্র আল্লাহ্ই তাদের অন্তরের ক্ষোভ ও ক্রোধকে নিরাময় করতে পারেন। আর আল্লাহ্‌তাআলাই আমাদের আনন্দকে আরও বাড়াতে থাকবেন। অতএব, রাবওয়াবাসী এবং পাকিস্তানে বসবাসকারী অন্যান্য আহমদীদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা যে আনন্দ দিয়েছেন ইহার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের প্রতিশোধ আল্লাহ্‌তাআলা এইভাবে গ্রহণ করেছেন যে, আজ আমি 'আন্তর্জাতিক মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া'কে নির্দেশ দিয়েছি যে, চন্দ্র-সূর্যের নিদর্শন সম্পর্কিত শত বার্ষিকী পূর্তির প্রেক্ষিতে রাবওয়া ও পাকিস্তানের আহমদী অধিবাসীদের নামে তাদের দিকে আরোপ করে তাদের আনন্দ উদযাপনের প্রোগ্রাম তৈরী করুন এবং সমগ্র পৃথিবীবাসীকে দেখান। কেননা আইন করে তাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, তাদেরকে আদেশ দেয়া হচ্ছে, "খবরদার ! তোমরা খোদাতাআলার কৃপাসমূহের উপর আনন্দ করতে পারবে না।" আমি বলছি, খোদার ফযল ও কৃপাকে পারলে রোধ করে তো দেখাও ! আনন্দ কি করে কেড়ে নিতে পার, তা একটু বুঝিয়ে বলতে পার কি? বস্তুত ঐশী-কৃপা অবতীর্ণ হবেই এবং ইহাতে আমরা আনন্দিত হবই। কিন্তু খোতাদাআলার ফযলের অবতরণ তোমরা কি করেই বা রোধ করবে? আল্লাহ্‌তাআলা তো বলেন ঃ "আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ফযল যাকে দিতে চান তাকেই দেবেন এবং দিতেই থাকবেন।" কাজেই রোধ করবে কীরূপে ? তিনি আরও বলেন ঃ "আল্লাহ্ মহান ফযলের অধিকারী।" তাঁর নিকট গণনাতীত ফযল রয়েছে। একটি ফযলকে রোধ করার চেষ্টা করলে আরও দশটি তিনি দান করবেন। দশটি রোধ করতে চাইলে আরো সহস্রটি দিয়ে দিবেন। কাজেই আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের উপর খোদাতাআলার যে ফযলের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে, উহা রোধ করার শক্তি আদৌ তোমাদের নেই। জোর লাগিয়ে দেখে নাও। আনন্দকেও রোধ করতে পারবে না। উহা অন্তরে সৃষ্টি হয়। আর তেমনি তোমাদের হৃদয় থেকে ক্ষোভ, ক্রোধ ও আক্ষেপ দুনিয়ার কোন শক্তি মুছে দিতে পারে না। উহা তোমাদের অন্তরে পুঞ্জীভূত হতেই থাকবে। কুরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, যখন 'আখারীনে'র মধ্যে ঐ সকল লোক সৃষ্টি হবে, যারা আল্লাহ্‌র ফযল ও কৃপায় বৃদ্ধি লাভ করবে। তাদের স্বপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হবে। তারা শস্য-ক্ষেত্রেরও ন্যায় অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট হয়ে উঁচু ও মজবুত হতে থাকবে, তখন কিছু সংখ্যক এরূপ জালেম লোক হবে, যাদের অদৃষ্টে ক্ষোভ ও ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ "লি-ইয়াগীযা বিহিমুল কুফ্ফার" অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)-এর অস্বীকারকারী হবে, তাদের ভাগ্যে ক্ষোভ ও ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই এই ক্ষোভ ও ক্রোধের কী ই বা চিকিৎসা বা প্রতিকার থাকতে পারে যখন কিনা খোদাতাআলা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন? বিষয়টি একটু খুলেই বলতে হয়। সূরা ফাতাহ্‌র শেষের রুকূতে সংশ্লিষ্ট আয়াতের উক্ত অংশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরবর্তী আরেকটি শান ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, তা যাচ্ছে তাঁর

'আহমদ' নামের জামালী তথা আহমদীয়তের শান ও মর্যাদার বিকাশ। এই শান ও মর্যাদা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মসীহী শান ও মর্যাদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইহার উল্লেখ ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য আমি কুরআন করীমের উক্ত আয়াত হতে প্রতিপাদিত বিষয়ের ভিত্তিতেই বলছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সেই শান ও মর্যাদার বিকাশ, যা তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত, উহা ভিন্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ "ওয়া মাসালুহুম ফিত্তাওরাতে"- উহাতে রয়েছে প্রভূত জালাল ও প্রতাপের কথা। যেমন উক্ত আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে ঃ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহি ওয়াল্লাযীনা মায়াহু আশিদ্দাউ আলাল কুফ্ফার"-

অর্থাৎ - মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ এবং তাঁর সাথীরা কাফিরদের মোকাবেলায় বড়ই কঠিন। তারা পরাক্রমশালী। তারা তলোয়ারের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তারা তাদের শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এই এক শান ও মর্যাদা। "ওয়া মাসালুহু ফিল ইঞ্জীল" -'তাওরাতে তাঁর ও তাঁর সাথীদের উক্ত শানই বর্ণিত হয়েছে।' এরপর বলা হয়েছে ঃ "কিন্তু এদেরই আর এক দৃষ্টান্ত শান ও মর্যাদা ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে।" উহা ভিন্নতর। উহাতে উল্লেখ রয়েছে নম্রতা বিনয় ও ক্রমোন্নতির কথা। তাদের এরূপ দুর্বল সূচনার উল্লেখ রয়েছে যে, দশজন ইচ্ছা করলে তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করে দিতে পারে। এবং এরা যে চারা-গাছের মত বৃদ্ধি পাচ্ছে, মনে চাইলে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। ইহা তাঁর (সঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের আরেকটি শান ও মর্যাদা। এখন লক্ষ্য করে দেখুন, উভয় শান ও মর্যাদার মধ্যে বর্ণনা ও বাচন-ভঙ্গীর দিক দিয়ে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। একই যুগের দু'টি অবস্থার বর্ণনা নয়। বরং ভিন্ন দু'টি যুগের ভিন্ন দু'টি অবস্থা। কাজেই আমরা ইহা বলার সত্য-সত্যই অধিকার রাখি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে শান ও মর্যাদার সম্পর্কে হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন, উহার বিকাশ সেই যুগেই অবধারিত ছিল যখন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (হযরত ঈসার মসীল বা সদৃশ মহাপুরুষ)-এর আগমন নির্ধারিত ছিল। অতএব, কী অপরূপ সাদৃশ্য! কুরআন করীমের দিকে আরোপ করে এরূপ কোনও কথা বলা হচ্ছে না যা কুরআনে বর্ণিত নয়। অতএব, দু'টি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের বর্ণনা, যা পরস্পর ভিন্নতর দু'টি অবস্থার উপরই প্রযোজ্য। একই সময়ে ঐ দু'টি প্রযোজ্য হতেই পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে মসীহিয়্যতের (মসীহ্সূলভ ব্যক্তিত্ব ও অবস্থার) ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে, যা হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঐ মসীহ্ তাঁর (সঃ) উম্মতে (আখেরী যামানায়) আগমন করবেন বলে সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। এই সবল বিষয়-বস্তু একত্রে মিলিয়ে দৃষ্টিপাত করলে ঐ সকল কথাই নির্ণীত ও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়, যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত আমরাই তারা যারা হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে কল্যাণ, বরকত ও আশিস লাভ করেছি। আমরাই তারা যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণে সচেষ্ট। যাদেরকে যুগের শেষে হওয়া সত্ত্বেও 'আওওয়ালীনে'র সাথে মিলিত করা হয়েছে। অধিকন্তু আমরা হ'লাম ঐ সকল সৌভাগ্যশালী লোক, যাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একশ' বছর পর সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐ সময় সৃষ্টি করা হয়েছে যখন হযরত মসীহ্ "মাসালুহুম ফিত্তাওরাত"- মাওউদ (আঃ)-এর একশ' বছরের ইতিহাস আদ্য-পান্ত আমাদের উদ্দেশ্যে পুনঃপ্রদর্শিত হচ্ছে। সর্ববিধ বরকত ও আশিস আমাদেরকে প্রদান করা হচ্ছে। খলীফা হওয়ার পর (১৯৮২ইং সালে) আমি আমার প্রথম বক্তৃতায় জামাতকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম যে, স্মরণ রাখুন, আমরা এখন এক অসাধারণ যুগের মধ্যে প্রবেশ করেছি। ১৮৮২ইং সালে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর উপর মামুরিয়তের (আল্লাহ্র তরফ হতে আদিষ্ট হওয়ার) ইলহাম হয়েছিল। এবং ৮২ সনেই আমাকে আল্লাহ্তাআলা খিলাফতের রূহানী পদমর্যাদায় আসীন করেছেন। ইহা ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও পদমর্যাদার ব্যাপার নয়। কেননা আমি নিজেকে এর মোটেই যোগ্য বলে মনে করি না। আমি খিলাফতের পদমর্যাদা ও উহার এক বিশেষ যুগের কথা বলছি। যে খিলাফতে আল্লাহ্ আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এর প্রারম্ভিককাল থেকে এর শেষ অবধি, ১৮৮২ সালের পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের শেষ নাগাদ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে। ঐ যাবতীয় বরকত ও আশিস, যা আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দিতে শুরু করেছিলেন তা সবই এই যুগের সাথে সম্পৃক্ত। এই আশিস ও বরকতের মধ্যে আমরা সকলেই শামিল। কেবল আমিই না বরং আপনারা সকলেই। আল্লাহ্তাআলা সমগ্র জামাতকে শুরু থেকে শেষ নাগাদ সমুদয় বরকত প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ই উত্তমভাবে জানেন, আমাদের মধ্যে কারা কত বরকত প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু দোয়া আমাদের ইহাই করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে বিপুল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যেন ১৯৮২ হতে শেষ পর্যন্ত - কমপক্ষে ২০০৮ইং সাল পর্যন্ত জীবিত থেকে আল্লাহ্তাআলার ফযল ও কৃপার সাক্ষী হতে থাকেন। ইহা সেই বরকতময় ও মহান যুগ, যার মধ্যে দিয়ে আমরা অতিবাহিত হচ্ছি। এর শোকরিয়ার হক্ কী করেই বা পালন করা যায়? তা অসম্ভব। ইহাই সেই যাদু, যার কথা আমি বলছি। এরই নেশায় আমরা এগিয়ে চলেছি। সেই যাদু, যা বাস্তব রূপ ধারণ করে দুনিয়ার রূপান্তর ঘটাবে। আপনারা যদি এই যাদুর নেশায় আচ্ছন্ন থাকেন, তাহলে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনসমূহ ঘটতে থাকবে। এই অনুপ্রেরণার সাথে আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসরমান হতে থাকুন। দুশমন দুঃখ-যাতনা দিলে দিক। দিতে থাকুক। আপনাদের অগ্রগতি তারা রোধ করতে পারে না। পারবে না। কখনও পারবে না। যা ইচ্ছা তারা করে নিক। কিন্তু আপনারা ওফাদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে এই পথে চলতে থাকুন। এ পথ হতে নিজেদের পা সরাবেন না। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, প্রত্যেক আগামী কাল ও প্রত্যেক সপ্তাহ আমাদের জন্য অধিকতর বরকত নিয়ে আসবে। প্রত্যেক আসন্ন বছর আমাদের জন্যে আসমান থেকে অধিকতর বরকত অবতরণের কারণ হবে। আমাদেরকে বরকতের দ্বারা অভিসিক্ত করবে। এই মহান যুগের মধ্য দিয়ে আমরা অতিবাহিত হচ্ছি। খোদাতাআলার হাম্দ ও সানার গীত গাইতে গাইতে এবং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পড়তে পড়তে অগ্রসরমান হয়ে যেতে থাক। কেউ নেই যে তোমাদের পথ রোধ করতে পারে। (পুনঃপ্রচারিত) (ওডিও ক্যাসেট হতে সরাসরি অনুবাদ) অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুরব্বী সিলসিলা

(২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং লন্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা থেকে উদ্ধৃতিবিশেষ)

"যে রওশনীর প্রদীপ আল্লাহ্ আহমদীদের অন্তরে জ্বেলে দিয়েছেন, তাতে পৃথিবীময় আলো ছড়িয়ে পড়ছে। সে প্রদীপগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরণের পথ তোমরা রোধ করতে পারবে না এবং সেগুলোকে কখনও নিভাতে পারবে না।" হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

১৩ই রমযানুল মুবারকের দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল এক দিন ছিল। কেননা আজ থেকে ঠিক একশ' বছর পূর্বে কাদিয়ানের দিগন্তে যা মক্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, খোদার ফযল ও করমে গোটা তের (১৩) শ' বছর কালের মধ্যে প্রথম বারই ঐ মহা জাঁকজমকপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন ঘটলো, যা ছিল হযরতে আকদস রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাহ্দীর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ। সে ভবিষ্যদ্বাণী আঁ-হযরত (সঃ)-এর সত্যতারই এক মহান নিদর্শন ছিল। ইহার উল্লেখ এ হাদীসটিতে পরিলক্ষিত হয় ঃ

গতকাল ছিল ১৩ই রমযান যে দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর প্রেমিকরা হাম্দ ও শোকরের দ্বারা অভিসিক্ত নয়নে তাকিয়ে ছিলেন আকাশের দিকে এবং তাদের আত্মা ছিল সিজদাবনত এবং দৃষ্টি ছিল আসমানী নিদর্শনের (চন্দ্রগ্রহণ) উপর স্থির। তদুপরি তারা অপেক্ষমান ছিলেন, সূর্যগ্রহণ হতে আর কতদিন বাকী। সে দিনগুলো কাটতে কাটতে কেটেই গেল এবং সেই ২৮ তারিখ এসে গেল, যে দিন সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়ে হযরতে আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, দুনিয়াতে মাহ্দীর দাবীদার বহুজনের উল্লেখ বিদ্যমান কিন্তু সমস্ত ইতিহাস তন্ন তন্ন করে দেখে নিন, কোথাও চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকে নিজের সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ পেশ করেছেন এরূপ একজন দাবীদারও নেই। তদুপরি সে দাবীদার নিজেও ইহার জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। তাঁর মান্যকারীরাও অপেক্ষমান ছিল, কবে আকাশে ঐ নিদর্শন দৃশ্যমান হবে। তেমনি তাদের শত্রুরাও প্রতীক্ষা করতে থাকে, ঐ নিদর্শন প্রকাশিত হবার পূর্বেই যেন এই দাবীকারক মরে যায় এবং তারা সচক্ষে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হতে দেখে নেয়। এহেন দ্বিপক্ষীয় প্রতীক্ষার পরিমণ্ডল বিরাজ করছিল, যা ১৮৮৯ইং হতে শুরু হয়, যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যথাবিহিত ধারায় মাহ্দী হবার দাবীর পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের গোড়াপত্তন করেন। তারপর আল্লাহ্র ফযলে ১৮৯৪ইং সালে উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী উহার সকল বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সহকারে পূর্ণতা লাভ করে।

আমরা ঐ বৎসরটিতে প্রবেশ করেছি, যা আসমানী সাক্ষ্যসমূহের বছর। ভূপৃষ্ঠের সাক্ষাৎ তো এই শ্রেণীর লোকেরা রদ করে দিয়েছে। এখন আকাশ হতে সাক্ষ্যসমূহ অবতীর্ণ হচ্ছে। (যেমন) টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জামাতের পয়গাম শ্রবণ করাও একটি আসমানী সাক্ষ্য। আল্লাহ্র অদ্ভুত শান যে, এ বছরই উল্লিখিত বিষয় দু'টি পরিপূর্ণতার মার্গে উন্নীত হয়।

কাজেই জামাত আল্লাহ্তাআলার ইহ্সান-সমূহের জন্য যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক ততই উহা অপ্রতুল বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই খুশী ও আনন্দের সাথে কিছু কন্টকও রয়েছে, যা দুশমনের অন্তরের আযাব বিশেষ। আর ইহাই আমাদের পথের কাঁটাস্বরূপ সাব্যস্ত হয়। এ সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হওয়াও তো অপরিহার্য ছিল। কেননা হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ঐ সকল গোলাম, যারা 'আখারীন'দের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে নির্ধারিত ছিল তাদের সপক্ষে বিশেষভাবে এই দৃষ্টান্ত (সূরা ফাতাহ্র শেষ রুকূ দ্রষ্টব্য) পেশ করা হয়েছিল যে, তাদের অবস্থা তেমনই হবে যেমন একটি বীজ বপন করা হয়। তা অঙ্কুরিত হয়। সে অঙ্কুর আপন কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হয়ে শক্ত ও মজবুত হতে আরম্ভ করে। তারপর অতি আনন্দদায়ক রূপ ধারণ করে। "আল-যুররায়া" বপনকারীগণ, যারা পরিশ্রম ও আন্তরিকতা দিয়ে চাষ করেছেন ইহা দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ঐ শস্য-ক্ষেত্র এত সুন্দরভাবে বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠে যে বপনকারীর অন্তরকে আনন্দে ভরে দেয়। কিন্তু স্মরণ রেখো তাদের মোকাবেলায় অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানকারীগণ অবশ্যই ক্ষোভ-ক্রোধ ও আক্রোশের শিকার হবে। একদিকে... শস্য-ক্ষেত্রটির পুষ্টি সাধন ও বৃদ্ধিলাভ যেমন মানব হৃদয়গুলিতে আনন্দ সুধা ভরে দিবে, তেমনি অন্যদিকে তাদের দুশমন ইহা দেখে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হতে থাকবে। প্রথমে পৃথিবীর পৃষ্ঠে সংঘটিত নিদর্শনাবলীর মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হতো। এখন আকাশ পথে নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলোকে বন্ধ করে দেখাও। এগুলোর পথ রোধ করে দেখাও। সেই পথ রোধ করার ক্ষমতা আদৌ তোমাদের নেই। মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র প্রজ্বলিত প্রদীপও কি কখনও নির্বাপিত হতে পারে? তোমরা রাবওয়াবাসীদের আলোকসজ্জা বন্ধ করে দিয়েছ কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে যে আলোকসজ্জা আমরা গতকাল বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছি ইহাকে তোমরা কী ক'রে রোধ করবে। ইহা তো সেই প্রদীপ নয় যা তোমাদের মুখের ফুৎকারে নিভতে পারে। তোমাদের অন্তরের আগুনও প্রকাশ পায়। জগদ্বাসী উহা দেখতে পায়। কিন্তু রওশনীর যে প্রদীপ আল্লাহ্তাআলা আহমদীদের অন্তঃকরণে জ্বেলে দিয়েছেন এবং পৃথিবীময় তাত্থেকে যে নূর (আলোক-মালা) ছড়িয়ে পড়ছে ইহার পথ তোমরা রোধ করতে পারবে না এবং এই প্রদীপগুলোকে তোমরা নিভাতে পারবে না। ইহা আসমান হতে অবতীর্ণ আলোক-মালা। এর উপর বান্দাদের হস্তক্ষেপ করার কোনও ক্ষমতা নেই।

এই খুশীর দিনগুলো বৃদ্ধি পাবে; বিস্তার লাভ করবে। উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হবে। এগুলো এমনই দিন, যা রাতগুলিকেও দিবসে পরিণত করবে। কাজেই তাদের এই উৎপীড়নে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে দুঃখ বা দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এগুলো আমাদের সাফল্যসমূহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অনিবার্য অংশস্বরূপ। পবিত্র কুরআনকে কি পরিবর্তন করা যায় ? কুরআন করীমেরই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা যত এগোবে দুশমন ততই কষ্ট অনুভব করবে। অতএব, তাদের এই কষ্টও এক নিদর্শন এবং আমাদের অগ্রসরমান হওয়াও নিদর্শন। ...

অতএব, ইহা তো এরূপ এক যুগ, যা অফুরন্ত আধ্যাত্মিক স্বাদ উপভোগ করার যুগ। এখন এক স্বর্গীয় নেশায় আত্মবিভোর হয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময়। ইনশাআল্লাহ্ আপনারা দেখবেন, দৈনন্দিন আল্লাহ্র ফযলে ঐশী কল্যাণ পূর্বাপেক্ষা অধিক শান ও মর্যাদায় অবতীর্ণ হবে। ফলে আসমানের রঙ যমীনের রঙকে বদলে দিবে। ইহা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। তাঁকে ইলহাম (ঐশীবাণী) যোগে বলা হয়েছিল, "রায় ও ধ্যানসমূহ পরিবর্তিত করা হবে।"-এই রং-ঢং বদলানো হবে। দেখবেন, ইনশাআল্লাহ্, দৈনন্দিন তদ্রূপই হবে।

(আল ফযল, ইন্টারন্যাশনাল ঃ ৪ঠা-১০ই মার্চ ১৯৯৪ সংখ্যা হতে অনূদিত)

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,**
মুরব্বী, সিলসিলাহ্

আহমদীয়া ফিকাহ্‌র পাতা থেকে ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিবাহ ও তালাক

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ফিকাহ্ এককালীন তিন তালাক ঘোষণাকে এবং এর প্রভাবকে ইসলামী শরীয়ত মতে সিদ্ধ ও কার্যকর বলে স্বীকার করে না এবং এই কথার ওপর জোর দেয় যে, যে বিষয়টিকে শরীয়ত 'তিন বার' পৃথক পৃথক সময়ে ও ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়াতে ন্যস্ত করে। তা তদ্রূপ তিন বারই হওয়া উচিত। কেননা কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলার ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"আত্‌তালাকু মাররাতানি ফা-ইম্‌সাকুম বি-মা'রূফিন আও তাসরীহুম বি-ইহ্‌সান"** (সূরা বাকারাহ্ ঃ ২৩০)। অর্থাৎ, এইরূপ তালাক (যার মধ্যে তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়া যায় তা) দু'বার হতে পারে। তারপর হয়তো সমীচীনরূপে (সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে) রাখতে হবে নয়তো সদ্ব্যবহারের সাথে তৃতীয়বার তালাক দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

(ক) এ আয়াতের পূর্বে আল্লাহ্‌র ইরশাদ হচ্ছে ঃ **"ওয়াল মুতাল্লাকাতু ইয়াতারাব্বাসনা বি-আন্‌ফুসিহিন্না সালাসাতা কুরূয়িন"** (সূরা বাকারাহ্ ঃ ২২৯)। অর্থাৎ, তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন হায়েয বা ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, **'আত্‌তালাকু মাররাতান'** -আয়াতে তালাক বলতে উক্ত আয়াতের দিকে নির্দেশ বুঝায়। এর অর্থ এই যে, যে স্ত্রীলোককে প্রথম বার তালাক দেয়া হয়েছে এবং সে ইদ্দত অতিবাহিত করেছে, তালাকদাতা স্বামী তাকে উক্ত ইদ্দত তিন ঋতুকালের (তিন মাসের) মধ্যে ফেরৎ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি উক্ত ইদ্দত পার হয়ে যায় তাহলে পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে তাকে আবার বিয়ে করে ফেরৎ নিতে পারে। এই ফেরৎ নেওয়া অথবা দ্বিতীয়বার বিয়ের পর যদি পুনরায় তালাক দিয়ে বসে তাহলে আবার তিন ঋতুকাল ইদ্দতের ভেতর স্ত্রীকে ঐ তালাকদাতা স্বামী ফিরিয়ে নেয়ার এবং ইদ্দত পেরিয়ে গেলে পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে বিয়ে করার অধিকার রাখে। এই দ্বিতীয়বার ফেরৎ গ্রহণ অথবা তৃতীয়বার বিবাহের পর যদি সে আবারও তালাক দেয়, তাহলে এই তৃতীয়বার তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে সে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারবে না এবং ইদ্দত অতিক্রমের পর সমঝোতার মাধ্যমে নতুন করে বিয়েও করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না-**"হাত্তা তানকিহা যওজান গায়রাহু"** (আয়াত নং ২৩১)-এর শর্ত পুরা হয়। **'আত্‌তালাকু মাররাতানি ফা-ইম্‌সাকুম বি-মা'রূফিন আও তাস্‌রীহুম বি-ইহ্‌সান'**-আয়াতটিতে উল্লেখিত ধারায় দেওয়া তিন বার তালাকের উল্লেখ রয়েছে।

(খ) আয়াতটিতে **'মাররাতান'** (দু'বার)-এর কথাটিতে পৃথক পৃথক দুই ক্ষেত্রে তালাক দেওয়ার অপরিহার্যতারই নির্দেশ রয়েছে। এ বিষয়টিই প্রণিধানযোগ্য।

'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে ঃ

"আয্‌যাহিরু আন্নাত্ তালাকাল মাশ্‌রূয়া লা ইয়াকূনু বিস্‌সালাসি দাফ্‌য়াতান বাল্ আলাত তারতীবিল মযকূরি ওয়া হাযা আয্‌হারু" (কিতাবুত্ তালাক বাবু মা জায়া ফি তালাকিল বাত্তা...পৃষ্ঠা নং ২৩২/৬)। অর্থাৎ, তালাক বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট যে, একই দফায় (এককালীন) তিন তালাক দেওয়াতে তালাক চূড়ান্ত হয় না, বরং কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত তরতীব (ক্রমধারা) অনুযায়ী তালাক দেওয়ার নির্দেশনা পালন করা আবশ্যকীয়। এ মসলা (অভিমত) টি-ই অধিক স্পষ্ট এবং সত্য-সঠিক।

অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলী অনুযায়ী একই ক্ষেত্রে একত্রে তিন তালাক দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। অতএব আহমদীয়া ফিকাহ্ মতে যদি একই সময়ে একত্রে তিন তালাক উচ্চারণ করা হয় তাহলে উহা মাত্র একটি **'রাজয়ী'** (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক বলে গণ্য হবে।

এক সাহাবী রুকানা (রাঃ) একই মজলিসে তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বসেন। দেওয়ার পর তাতে তাঁর অনুশোচনা হয়। যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ হয় তখন হুযূর (সঃ) জিজ্ঞেস করেন, সেই সাহাবী তালাক কীভাবে দিয়েছিলেন। তিনি (রাঃ) বলেন, একই মজলিসে তিনি তালাক দিয়েছিলেন। তাতে আঁ হযরত (সঃ) বলেন, 'এভাবে তো একবার তালাক অনুষ্ঠিত হয়। তুমি 'রুজু' (প্রত্যাহার) করে নাও (-স্ত্রীকে গ্রহণ করে নাও)' (মুস্‌নাদ আহমদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৫)। প্রামাণ্য রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং হযরত আবুবকরের (রাঃ) সমগ্র খিলাফতকালে এবং হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতকালের প্রথমাংশটিতে একই মজলিসে (এককালীন) প্রদত্ত তিন তালাককে মাত্র একটি তালাক বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) যখন অনুভব করলেন যে, শরীয়তের দেওয়া একটি সুবিধাকে কিছু সংখ্যক লোক খেলা বানিয়ে ফেলেছে তখন তিনি আদেশ দেন, এই লোকগুলির তাড়াহুড়ামূলক আচরণের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঐরূপে দেওয়া (এককালীন) তিন তালাককে তিন বারের তালাক বলেই নেয়া হোক, যেন লোকগুলো সাবধান হয় (সহী মুসলিম, মিসরে মূদ্রিত, কিতাবুত্‌তালাক বাবু তালাকিস সালাস পৃঃ ৬৭২)। কিন্তু হযরত উমরের (রাঃ) সে আদেশটি **'তা'যীর'** অর্থাৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থারূপে ছিল। এটাকে স্থায়ী আদেশস্বরূপ আখ্যায়িত করা যায় না। তাছাড়াও যে সকল ফুকাহা (ফিকাহ্‌বিদগণ) একই ক্ষেত্রে এককালীন তিন তালাককে তিন বারের তালাক হিসেবে স্বীকার করেছেন তারাও অনুরূপ তালাককে **"তালাকে বিদ্‌আত"** নাম দিয়েছেন। অন্যকথায়, ইহা অপসন্দনীয় বলে তাদের নিকটও স্বীকৃত। অতএব, আহমদীয়া ফিকাহ্ এই বিদ্‌আতকে শরীয়তগত মর্যাদা দেয় না এই অর্থে যে, একই ক্ষেত্রে ওরূপে দেয়া তিন তালাকের পর যদি কেউ অনুতপ্ত হয় এবং 'রুজু' (প্রত্যাহার) করতে চায় তাহলে তার জন্য রুজু করার অধিকারকে গ্রহণ করা যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"যদি একই সময়ে তিন তালাক দেয়া হয় তাহলে ঐ স্বামীকে এই 'ফায়েদা' (সুযোগ) দেয়া হয়েছে যে, সে 'ইদ্দত' (তিন তোহ্‌র) পেরিয়ে যাবার পরও সেই স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারে। কেননা, এই তালাক না-জায়েয তালাক ছিল এবং আল্লাহ্ ও রসূলের 'ফরমান' (নির্দেশ) অনুযায়ী দেয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে কুরআন করীমে গভীর দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার জানা যায় যে, দীর্ঘ দিনের সম্পর্কে জড়িত স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ত্যাগ করে পৃথক হয়ে পড়ুক এটা আল্লাহ্‌তাআলা নিতান্তই অপসন্দ করেন। এ কারণেই তিনি তালাকের

প্রসঙ্গে শর্তাবলী আরোপ করেছেন। বিরতি দিয়ে দিয়ে তিন বার তালাক দেওয়া এবং তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) একই জায়গায় অবস্থান করা ইত্যাদি এই যাবতীয় বিষয়গুলো এ উদ্দেশেই যে, হয়তো কোন সময় তাদের মনোমালিন্য দূর হয়ে যেন তাদের মধ্যে পরস্পর মিল ও সমঝোতা হয়ে যায়। খোদাতাআলা বলেন, "আত্‌তালাকু মাররাতানি"-অর্থাৎ দু'বার তালাক হবার পর হয়তো তাকে (স্ত্রীকে নিজের নিকট) রেখে নেয়া যায় অথবা সদ্ব্যবহারের সাথে পৃথক করে দেয়া হয়। যদি এতো দীর্ঘ সময়েও তাদের মাঝে পরস্পর মিল ও সমঝোতা না হয় তাহলে তাদের পক্ষে সংশোধিত হওয়া আর সম্ভব না" (আল্ হাকাম ৭ম খন্ড)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ "সাধারণভাবে এ যুগের উলামা মনে করেন, যে ব্যক্তি (এককালীন) তিন বার তালাক বলে দিল তার তালাক বায়েন (চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদের কারণ) হয়ে যায়। অর্থাৎ, তার স্ত্রী তার সাথে পুনরায় বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কারও কাছে বিয়ে বসে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। কেননা, কুরআন করীমে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "আত্‌তালাকু মাররাতান" অর্থাৎ ঐ তালাক যা 'বায়েন' নয় তা দু'বার হ'তে পারে। এভাবে যে, প্রথমে কোন স্বামী তালাক দিল, তারপর তালাক ফিরিয়ে নিল এবং ইদ্দতের ভেতর রুজু (স্ত্রীকে গ্রহণ) করলো। অথবা ইদ্দত (তিন কুরু তথা তিন মাস) পার হ'তে দিল। তখন তাকে নতুনভাবে বিয়ে করে গ্রহণ করতে হবে। তারপর বনিবনা না হবার দরুন দ্বিতীয় বার তালাক দিল। সুতরাং ঐরূপে দু'বার তালাক হওয়া তো অকাট্যভাবে প্রমাণিত। অতএব, একই সময়ে তিনবার বা ততোধিক বার 'তালাক' বলে দেওয়াতে এটাকে 'বায়েন' (চূড়ান্ত বিচ্ছেদমূলক) আখ্যা দেয়া কুরআন করীমের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। **তালাক কেবল ওটাই 'বায়েন' হয়ে থাকে যা উল্লেখিত পদ্ধতিতে পৃথক পৃথক সময় ও ক্ষেত্রে তিন তিনটি ইদ্দত অতিক্রান্ত হবার পর দেওয়া হয়।** ঐ অবস্থায় (অর্থাৎ যথারীতি তৃতীয়বার তালাকের পরে) বিয়ে জায়েয নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় অন্য কারও কাছে বিয়ে বসে এবং তার কাছ থেকে (স্বাভাবিক ঘটনাক্রমে) তালাক প্রাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে এই তালাক খেলার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর প্রতিকার 'হালালা বা হিলা শরা -এর ন্যায় নোংরা ও অশ্লীল প্রথার দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছে" (তফসীরে সগীর, সূরা বাকারাহ্‌র ২৩০তম আয়াতের অধীনে)।

'হালালা' নামে যে প্রথাটা কোন কোন মুসলিম ফির্কা বা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলন দেয়া হয়েছে তার স্বরূপ এই বর্ণনা করা হয় যে, কোন ব্যক্তি যে রেগে গিয়ে অথবা ভুলবশতঃ তাড়াহুড়া করে তার স্ত্রীকে একযোগে তিন তালাক দিয়ে বসলো। এরপর উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় পরস্পর বিয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছুক হলো। কিন্তু যেহেতু এই ফির্কাগুলোর অভিমত অনুযায়ী উক্ত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এককালীন তালাকের দরুন 'তালাকে বায়েন বা বাত্তা' (চূড়ান্ত বিচ্ছেদ) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং "হাত্তা তানকিহা যওজান গায়রাহু" (-যতক্ষণ পর্যন্ত না সে (স্ত্রী) তদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করে')-এর শর্ত পূর্ণ করা ব্যতিরেকে তারা উভয়ে দাম্পত্য জীবনে ফিরে যেতে পারে না, সেহেতু অন্য কোন ব্যক্তিকে তৈরী করা হয় যাতে সে এই স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করে যৌন সম্পর্ক কার্যকর করার পর তালাক দেয়, যাতে ঐ স্ত্রীলোকটি তার পূর্ব-স্বামীর ঘর করতে পারে। কিন্তু ইসলাম কখনও এই কৃত্রিম ও চরম অশ্লীল পদ্ধতি বা প্রথা অবলম্বনের অনুমতি দেয় নি। আঁ হযরত (সঃ)-এর ইরশাদ রয়েছে ঃ "লায়ানাল্লাহুল মুহাল্লিলা ওয়াল মুহাল্লা লাহু" (আবূ দাউদ, কিতাবুল নিকাহ বাবু ফিত্‌তাহ্‌লীল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৩)। প্রকৃতপক্ষে এই অপরাধপূর্ণ অশ্লীল প্রথা আবিষ্কারের জন্য দায়ী হচ্ছে তালাক সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বিধান ও পদ্ধতি লঙ্ঘন এবং এককালীন তালাককে চূড়ান্ত তালাক হিসেবে গণ্য করান।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ -মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

কবিতা

জাগো মুসলিম জাহান

ওগো মুসলিম জাহান,
এ মলিন দশা কেন আজ, কেন মুখ তব ম্লান?
যারা ছিলো একদিন শৌর্যে, বীর্যে মহীয়ান।
কোথা আবুবকর, উসমান, উমর, আলী
কোথায় তাদের খিলাফত?
একই নবীজীর উম্মত মোরা
তবু কেন আজ মোদের এ দুর্দশা?
তবু কেন আজ মোরা সর্বহারা?
মোদের এক আল্লাহ, হাতে মোদের আল্‌কুরআন।
তবু কেন মোরা সম্মুখে হতে পারি না আগুয়ান?
ভুলেছি মোরা মোদের শপথ,
ভুলেছি মোরা সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ।
হয়েছি শতধা,শতদলে বিভক্ত।
চারিদিকে দাজ্জালের হাত তাই আজ প্রসারিত।
ইয়াজূজ মাজূজের লেলিহান শিখা
গ্রাস করিয়াছে ইসলামের জ্যোতিঃ
ওগো মুসলিম জাহান ওঠো, জাগো
দেখো শেষ হয়েছে কালবেলা।
যামানার মাহদী এসেছে ধরিতে সে ছিন্ন রশি।
বিশ্বনবীর পূর্ণ প্রতিবিম্ব, আখেরী যামানার শশী।
তাঁরই খেলাফতের রজ্জু ধরে
বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করিব বিশুদ্ধ ইসলাম।
ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ দীন।
চলো লাখো কণ্ঠে তাঁকে জানাই সালাম
আর পাঠ করি লাখো দুরূদ তাঁর তরে
যিনি আমাদের প্রিয় খাতামান্ নাবীয়ীন (সঃ)।

সাজেদা মতিন

'কিন্তু'র মহাসাগরে

'কিন্তু'র মহাসাগর অতিক্রম করতে হবে ঃ

৩১.১০.৯৯ তারিখে সংবাদে প্রকাশিত একটি খবর ছিলো যা একটি বড় ধরনের সুখবর। এই 'সু'তে পৌঁছুতে হলে মানুষকে 'কিন্তু'র মহাসাগর অতিক্রম করতে হবে। বিজ্ঞান যেসব গুরুত্ববহ ও কল্যাণকর সম্ভাবনার কথা বলে তা যদি আপ্‌ছে সাথে সাথে কার্যকর হতো তবে কতই না সুবিধা ও আনন্দের হতো ! তা হয় না। কারণ অযাচিত অনেক দুর্গম 'কিন্তু' এসে পথ আগলে বসে, নানা কঠিন হতে কঠিনতর বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করে।

আগামী সহস্রাব্দে মানুষ বাঁচবে ১২০ বছর

লন্ডন, ৩০শে অক্টোবর (রয়টার্স)-আগামী সহস্রাব্দে জন্ম-নেয়া শিশুরা ৩ বছর বয়সে স্কুলে যেতে শুরু করবে, ২০ বছর বয়সে ব্যক্তিগত পেশা আরম্ভ করবে এবং ১শ' ২০ বছর বাঁচবে। বৃটিশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফিউচার ফাউন্ডেশন শনিবার এক রিপোর্টে একথা বলেছে।

রিপোর্টে বলা হয়, ৬০ বছর বয়সেও লোকজন অবসর নিতে চাইবে না, এমনকি তারা নিজেদের বুড়ো ভাবতেও চাইবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়বে বলে এতে উল্লেখ করা হয়।

সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ জীবন লাভের প্রধান উপায়। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে দু'টো বড় 'কিন্তু' হলো (১) উন্নয়নকামী দেশগুলোতে স্বাস্থ্য ও বিধি সম্পর্কে অজ্ঞতায় ব্যাপকতা। তা কাটিয়ে উঠতে হ'লে সমাজের সর্বস্তরে প্রচুর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। (২) যারা স্বাস্থ্য জ্ঞান রাখেন তাদের বিধি-নিষেধ পালনে অবহেলা।

মানুষের হস্তক্ষেপে ও কর্মকান্ডে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে আহত হচ্ছে। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের যেমন ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্লাবন, মহাপ্লাবন, খরা, ইত্যাদির মাত্রা অনেক বেড়ে চলেছে। তাছাড়া মানুষ নিজেও নিজের জন্য ভয়াবহ ধ্বংস-যজ্ঞ সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথাই ধরা যাক। বিশ্ববাসী দু'টো মহাযুদ্ধে আক্রান্ত হয়ে চূড়ান্ত দুর্ভোগে ভোগেছে। এতে লাখ লাখ জীবন অকালে ঝরে পড়েছে। ভবিষ্যতে এর চেয়ে অনেক গুণ বেশী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ হবে না তা তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যখন যে যুদ্ধই হউক না কেন, তাতে যুবকরাই বেশী প্রাণ হারায়। ১২০ বছর বয়স্কদের দ্বারা যে যুদ্ধ চলবে না তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

এখনতো অনেক দেশেই দীর্ঘকাল স্থায়ী গৃহযুদ্ধ চলছে। এক দেশ অন্য কোন দেশের সাথে যুদ্ধ

উটেচড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

(শেষ কিস্তি)

করছে তা নয়। কখন পৃথিবী হতে সব ধরনের যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বিদায় নিবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এসব যুদ্ধে স্বল্প বয়সীরাই মারা যাচ্ছে।

জীবনের আরো ঘনিষ্ঠতর ক্ষেত্রে আসা যাক। এমন করে তুলনায় 'উটেচড়া নবীর' যুগে সড়ক ও জলপথে দুর্ঘটনা ঘটার পরিসর খুবই সীমিত ছিলো। আকাশ পথে তো মানুষের যাতায়াতই ছিল না। এ যুগে যানবাহনের ধরনও প্রাচুর্য বেড়েই চলেছে। স্থল পথে বিশ্বজুড়ে রোজ শত শত লোক দুর্ঘটনায় অকালে মৃত্যুবরণ করছে। এজন্যে নেশাখোর অমনোযোগী ও অতি লোভী চালকরা দায়ী নন। বর্তমানে জলপথে মানুষ পানির উপর দিয়েই শুধু চলে না, সাগর, মহাসাগরের অভ্যন্তর দিয়েও যাতায়াত করে। এসব কারণে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রও অনবরত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। কিছুদিন হলো রাশিয়ার ডুবো জাহাজ কুরস্ক পানির নীচে দুর্ঘটনায় ১১৮ জন সুশিক্ষিত নাবিককে হারালো। তখনকার যুগে মানুষ আকাশ পথে যাতায়াতের কথা ভাবতে পারতো কিনা জানি না। কিন্তু এখনতো দ্রুত যাতায়াতের বাহনই হলো আকাশ যান। এতে দুর্ঘটনার অনেক লোক অকালে প্রাণ হারায়। এ যুগে বহু লোক খনির কাজে নিয়োজিত আছে। তাতেও দুর্ঘটনায় প্রতি বছর বহু লোক অকালে প্রাণ হারায়। দুর্ঘটনার বিষয় ছাড়াও মানুষের বিপথগামিতা যে কত অকাল মৃত্যু ঘটায় তা বলে শেষ করা যাবে না। নেশায় মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে। ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও তৎপর ধর্ষিতাকে হত্যা যে কত বড় অমানবিক কাজ তা বলে শেষ করা যায় না। ইহা অকাল মৃত্যুর একটি ঘৃণ্যতম উৎসে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ হত্যাই হলো শিশু কিশোরী। ডাকাত, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী ইত্যাদি জঘন্য চরিত্রের লোকদের হাতেও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সন্ত্রাসী দলগুলোর পরস্পর খুনা-খুনীতেও অকালে দুনিয়া হতে বহুলোক বিদায় নিচ্ছে। খাদ্য, ওষুধ, সার এসবে ভেজাল দেয়াতে স্বাস্থ্যহানী, ফলন কম এবং মাটির উর্বরাশক্তি ভীষণভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অনেক সময়ে এগুলোও অকাল মৃত্যুর বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিষ্পাপ শিশু হত্যা ও তুচ্ছ কারণে হত্যার কিছু হৃদয়বিদারক উদাহরণ দিয়ে আলোচনার ইতি টানা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে অনেক কাটিংস জমেছে। এখানে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হলো। ১.১১.৯৯ তারিখে সংবাদ প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনামসহ প্রথম প্যারার উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

বন্ধুবেশি হত্যাকারীর হাতে নিহত ১৪০টি কলম্বীয় শিশু

বেগোটা, ৩১শে অক্টোবর (রয়টার্স)-কলম্বিয়ার নাগরিক লুইস আলফ্রেদো গারাতিতো স্বীকার করেছেন ধর্ষণ ও নির্যাতনের পর গত সাত বছরে প্রায় একশ' চল্লিশটি শিশুকে হত্যার মাধ্যমে তিনি খুনের হোলিখেলায় মেতেছিলেন। গারাতিতোর পরিচালিত হত্যাকান্ড এ পর্যন্ত কলম্বিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ধারাবাহিক হত্যাকান্ড। হত্যা মামলা পরিচালনাকারী প্রধান আইনজীবী আলফালো গোমেজ শুক্রবার এ খবর জানান।

এই শিশুরা হয়তো দীর্ঘ জীবনের অর্থ বুঝার আগেই ঘাতকের হাতের শিকার হলো। এদের অকাল মৃত্যুতে আমরা হয়তো প্রতিভাবান শিশুও হারিয়েছি।

৩.৯.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনামসহ প্রথম প্যারাটির উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

শিশু নিশির মৃত্যু হয়েছে নির্মম নির্যাতনে ॥ আটক দম্পতির স্বীকারোক্তি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নির্মম নির্যাতনই ছয় বছরের শিশু নিশির মৃত্যুর কারণ বলে ময়না তদন্তে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। এই শিশু হত্যা ঘটনায় গ্রেফতারকৃত দম্পতিকে শনিবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে আনা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আনোয়ার ও নাসরিন হত্যাকান্ডের কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

একই তারিখের দৈনিক জনতা এ বিষয়ে সম্পাদকীয়ের এক স্থানে বলে, '৬ বছর বয়সী অবুঝ শিশুটির অপরাধ, রান্না করা এক বাটি ডাল সে নষ্ট করে ফেলেছিল। এতেই গৃহকর্ত্রী নাসরিন তাকে পেটাতে থাকে। এক পর্যায়ে লোহার রড গরম করে তার শরীরে ছ্যাঁকা দিতে থাকে। অপর দিকে স্বামী আনোয়ার হোসেন জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে শিশুটির শরীর পুড়িয়ে দিতে থাকে।'

এ বিষয়ে ১৬.৯.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে 'চতুরঙ্গে' 'শিশু হত্যার অভিশাপে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা' নামে জনাব আবদুল মতিনের একটি মর্মস্পর্শী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এ লেখাটি হ'তে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ যা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) দ্বারা চিহ্নিত।

(ক) সত্যিই সভ্যতার এই অসভ্য আমলে ওদের জন্য যেন মৃত্যুই অপেক্ষা করে থাকে। এই লোমহর্ষক কাহিনী পড়ে অনেক কোমলমতি শিশুই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

(খ) এমনকি ক্ষুধার্ত শিশুটিকে খাবারের পরিবর্তে মলমূত্র মুখে ঢেলে দেয়া হতো।

(গ) শিরিয়া, তোমার এই বর্ণনা শুনে তো আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে ওঠার কথা। এই কথা শিরিয়া বেগম বলছিল গত রবিবার (আগষ্ট ৩) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সামনে। ঘটনার ইতিবৃত্ত দিতে দিতে এক পর্যায়ে মন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। মন্ত্রী তাৎক্ষণিক ভাবে দ্রুত চার্জসীট দেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন।

(ঘ) ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক একটি জাতীয় দৈনিককে জানান, জীবনে এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন তিনি আর দেখেন নি। লাশের গায়ে নির্যাতনের চিহ্ন দেখে ডাক্তাররাও অশ্রুপাত করেছে।' (তারিখটি সেপ্টেম্বর ৩ হবে)

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ৪ শিশুসন্তানকে জবাই

নিয়ামুল কবীর সজল, ময়মনসিংহ থেকে ঃ পারিবারিক তুচ্ছ বিরোধকে কেন্দ্র করে এক পাষন্ড মা তার চার শিশু সন্তানকে জবাই করে হত্যা করেছে। গত শুক্রবার রাতে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী খোদাবক্সপুর গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত শিশুরা হচ্ছে- তাসলিমা (৮), আকলিমা (৬), কুলসুমা ও (৪), ছাবিনা (২)। স্থানীয় জনতা ঘাতক মা রাশিদাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে আলাপে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাশিদার সঙ্গে তার জা (ভাশুরের স্ত্রী) ফাতেমার ঝগড়া হয়। ফাতেমার হাতে রাশিদা এ সময় কিছুটা আহত হয়। রাতে স্বামী আবদুল খালেক বাড়ি এলে ঘটনা জানায়। কিন্তু খালেক উল্টো রাশিদাকে বকাঝকা করে। শুক্রবার দিনে এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ আরো চরমে উঠে। এক পর্যায়ে খালেক রাশিদাকে তালাক দেয়ার হুমকি দেয়।

রাত ৯টার দিকে খালেক মাছ ধরতে বাড়ির বাইরে গেলে রাশিদা ঘুমন্ত অবস্থায় তার নিজেরই গর্ভজাত চার শিশু কন্যাকে ছুরি দিয়ে জবাই করে। তারপর পাষন্ড রাশিদা মৃত শিশুদের ঘরে রেখে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনের শিখা দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। আগুন নেভানোর পর গ্রামবাসী মৃত চার শিশুর লাশ উদ্ধার করে।

১৯.৯.৯৯ তারিখের প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি খবরকে কিছু কাটছাট করে এখানে দেয়া হলো। ধৈর্য ধারণের উপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। জীবনকে সার্থক করতে এর স্থান অতুলনীয়। ধৈর্যহারা হলে আপন নির্দোষ নিষ্পাপ সন্তান যারা মা বাপের ঝগড়ার সাথে মোটেও জড়িত নয়, তারাই মার নিষ্ঠুর নির্দয় হাতে অকালে প্রাণ হারালো।

২৫.১২.৯৯ তারিখে প্রথম আলোতে একটি হৃদয় বিদারক খবর ছিলো ঃ

ডালিম মারা গেল

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি ঃ এক গ্লাস রসের জন্য যে ১০ বছরের বালককে কুষ্টিয়ার খোকসা থানার ভবানীপুর গ্রামের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, হতভাগ্য সেই ডালিম শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। গত ১৯ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ২ নম্বর ওয়ার্ডে ডালিম মারা যায়।

এর আগে গত ১৩ ডিসেম্বর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ডালিমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। গত ১৯ ডিসেম্বর প্রথম আলোর বিশাল বাংলায় এক গ্লাস রসের জন্য– শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। জানা যায়, ভবানীপুর গ্রামের দরিদ্র ভ্যানচালক দিলবার মালিহার ছেলে ডালিম গত ১৩ ডিসেম্বর একই গ্রামের আজগর খানের আখ মাড়াই কলে যায় এবং এক গ্লাস আখের রস খেতে চায়। তখন আজগর খান এক গ্লাস রসের বিনিময়ে ২০ বোঝা আখ মাড়াই কলের মধ্যে দেয়ার প্রস্তাব দেয় । ডালিম ওই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ২০ বোঝা আখ মাড়াই করে দেয়া শেষ করে রস খেতে চায়। কিন্তু আজগরের ছেলে কামাল ২০ বোঝা আখ মাড়াই কলে দেয় নি বলে ডালিমকে জাপটে ধরে মাড়াই কলের আগুনে ফেলে দেয়। এ ব্যাপারে ডালিমের পিতা চারজনকে আসামি করে খোকসা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। অন্যান্য প্রাণীকে ইতর প্রাণী বলা হয়। মানুষ যখন মানবতা ও নৈতিকতাবোধ হারিয়ে ফেলে তখন সে 'নিকৃষ্টতম' জীবে পরিণত হয় কুরআন তা-ই বলে (সূরা তীন)।

জাতিসংঘ দিবসের বাণী ঃ নতুন শতাব্দী হোক শান্তিপূর্ণ ও মানবিক

–কফি আনান

জাতিসংঘ, ২৩ শে অক্টোবর (রয়টার্স) ঃ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বলেছেন, বিংশ শতাব্দী মানব ইতিহাসে সবচেয়ে হত্যাকান্ড বহুল শতাব্দী। তিনি বলেছেন, নতুন শতাব্দীকে হ'তে হবে আরো শান্তিপূর্ণ ও মানবিক।

কফি আনান শনিবার বলেন, এটা খুবই বেদনাদায়ক যে, বিশ্বের ছয়শ' কোটি মানুষের মধ্যে তিনশ' কোটি মানুষ অতি দরিদ্র অবস্থায় নতুন শতাব্দীতে পদার্পণ করছে। জীবন ধারণের জন্য তারা পাচ্ছে দৈনিক মাত্র তিন ডলার কিংবা তারও কম।

২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে কফি আনান বলেন, এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সনদ কার্যকরী হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর দিবসটি পালিত হচ্ছে। কফি আনান বলেন, এটা খুব দুঃখের বিষয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ সহিংসতা এবং বর্বরতাকবলিত।

জাতিসংঘের মহাসচিব আরো বলেন, এটাও উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয় যে, বিশ্বে এমনভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে যা লাখ লাখ মানুষের বাসস্থান এবং জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে। এ বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করাও আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

জাতিসংঘ দিবস পালন উপলক্ষে কফি আনান যে বাণী দিয়েছেন ২৪.১০.৯৯ তারিখের সংবাদে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা তুলে ধরা হলো। এতে যে চিত্র ফুটে ওঠেছে তা কোন শতাব্দীর জন্যেই অতীব গুরুত্ব সহকারে স্মরণ ও অনুসরণ যোগ্য তা হলো যে ব্যক্তি বা সমাজ অন্যায় অবিচারে উৎসাহ বা প্রশ্রয় দেয় সে ব্যক্তি বা সমাজ কোন যুগেই সুখশান্তির উৎস হতে পারে নি। এযুগেও পারার কোনই কারণ নেই। কেননা অন্যায়ে উৎসাহ ও প্রশ্রয় জাহেলিয়ত তথা অবক্ষয়ের উৎসরূপে কাজ করে থাকে। এর প্রসারে মানুষ মানবতাবোধ হারিয়ে ফেলে। তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পংগু হয়ে পড়ে। এতে অগ্রগতির বড় বড় সম্ভাবনাও বৃথায় পর্যবসিত হয়। খুবই বেদনাদায়ক যে, ১২০ বছর বাঁচার বেলাতেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। এখানেও 'কিন্তু'র মোটেও অভাব নেই। সু বা কু-ধারণা ও কর্মাদির মঙ্গল ও অমঙ্গল সমাজে প্রচলিত বাস্তবতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। বাস্তবতাই আসল কষ্টিপাথর।

–মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

তাহ্‌রীকে জাদীদ

(৫ম কিস্তি)

আমাদের চাঁদা

সত্যের পূর্ণ প্রচার ঃ

মহান আল্লাহ্‌তাআলা চাইলেন দুনিয়াতে পূর্ণভাবে তাঁর জ্যোতির্বিকাশ ঘটাতে। আর এই উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে তিনি তাঁর প্রথম বিকাশ ঘটালেন হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে। হযরত আদম (আঃ) হলেন মানবের প্রথম শিক্ষাগুরু-প্রথম নবী। মানবকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমে দুনিয়াতে 'ঐশী রাজত্ব' প্রতিষ্ঠাকল্পে যুগে যুগে এই শিক্ষাগুরু তথা নবী ও রসূলকে প্রেরণ করতে লাগলেন আল্লাহ্‌তাআলা। একজন ছাত্র যেমন পর্যায়ক্রমে ক্লাসের ধাপে ধাপে শিক্ষা গ্রহণ করে সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে উচ্চ ডিগ্রী লাভ ক'রে থাকেন তেমনি যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দেয়ার জন্যে এগিয়ে নিয়ে চল্লেন মহান আল্লাহ্‌তাআলা। সপ্তম শতাব্দীর এক শুভ লগ্নে তিনি প্রেরণ করলেন সর্ব যুগের জন্যে এক সার্বজনীন শিক্ষা গুরু; নাম তাঁর মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সঃ)। তিনি এমন এক ঐশী গ্রন্থের ধারক ও বাহক হয়ে আসলেন যার দাবী হলো, তা পূর্ণগ্রন্থ-পূর্ণআশিস ও সার্বজনীন জীবন-বিধান; নাম তার কুরআন মজীদ। আর এই ধর্মের নাম রাখলেন তিনি ইসলাম। বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট একটিই ধর্ম-ইসলাম। ইহা ব্যতিরেকে অন্য কিছু গ্রহণীয় নয়, কেননা ইহাই পরিপূর্ণ ধর্ম।

আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ জীবন বিধান আল্ কুরআনের সূরা সাফ্‌ফে তিনি ঘোষণা দিলেন-**হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লি ইউযহিরাহু 'আলাদ্দীনি কুল্লিহী ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকূন** (অর্থাৎ তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য-ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের ওপরে জয়যুক্ত করে দেন, মুশরিকগণ যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন (৬৯ঃ১০)। আল্লাহ্ কর্তৃক সূরা মায়েদার চতুর্থ আয়াত অনুযায়ী দীন পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সূরা সাফ্‌ফের উপরোক্ত আয়াত মোতাবেক দীনের পূর্ণ প্রচার ও সকল ধর্মের ওপর এর জয়যুক্ত হওয়া আঁ হযরত (সঃ)-এর সময়ে পরিপূর্ণভাবে ব্যাপকতার সাথে সম্পন্ন হয় নি। কেননা, তাঁর সময়ে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা বিরাজমান ছিল। আর যোগাযোগের সুব্যবস্থা না থাকার কারণে সারা দুনিয়ার ধর্মগুলো সম্বন্ধে মানুষ তখনকার দিনে অবহিতই ছিল না। জানা যায় যে, দুনিয়াতে এখন প্রায় ২,৫০০ ধর্ম রয়েছে। সুতরাং সব ধর্মের ওপরে জয়যুক্ত হওয়ায় প্রশ্নই তখন ওঠে না। যুক্তি-দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শনের ক্ষেত্রে তৎকালীন পরিচিত জগতে ইসলামের বৈপ্লবিক বিজয় সম্পন্ন হলেও সার্বজনীন সার্বিক বিজয় নবী আকরম (সঃ)-এর এক গোলামের মাধ্যমে অর্থাৎ তাঁর আধ্যাত্মিক দ্বিতীয় আগমনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল – (৬২ঃ৪)। আল্ কুরআনের সূরা সাফ্‌ফের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণও ইসলামের সার্বজনীন বিশ্ব বিজয়কে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে বলে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর আগমনই রসূল করীম (সঃ)-এর আগমন যদিও তা দৈহিকভাবে নয়, আধ্যাত্মিকভাবে (সূত্র-সূরা জুম্‌আ, বুখারী ঃ কিতাবুত্ তফসীর, বেহারুল আনওয়ার, মাজমাউল বেহার প্রভৃতি)।

নয়া বিশ্ব-ব্যবস্থা

আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি ও হুযূর (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আঁ হযরত (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক দ্বিতীয় বিকাশ হিসেবে আগমন করেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উম্মতকে এই আশার বাণী শুনিয়েছিলেন – **লানতাহ্‌লুকা উম্মাতুন আনা ফী আওওয়ালেহা ওয়া ঈসাবনু মারয়ামা ফী আখিরিয়া ওয়াল মাহদিউ ফী ওয়াসাতিহা** অর্থাৎ সে উম্মত কখনও ধ্বংস হতে পারে না যার প্রথমে আমি রয়েছি, শেষে মসীহ্ মাওউদ রয়েছেন আর মাঝখানে মাহদী রয়েছেন (কনযুল উম্মাল ঃ ৭ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা আরও, জামেউস সগীর ঃ ২য় খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা)। হুযূর (সঃ) উম্মতকে এই বলে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন-**সুম্মা তাকুনু খেলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওয়ত** অর্থাৎ সেই বক্রযুগের পরে পুনরায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত কায়েম হবে (মিশকাত ঃ হযরত নু'মান বিন বশীরের বর্ণনায়)। এখানে উল্লেখ্য, হুযূর (সঃ)-এর শতাব্দী ও নিকটবর্তী ২ শতাব্দী উত্তম। এরপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব। এ সময় উম্মতের উপর দিয়ে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হবে যাকে **ফাইযে আওয়াজ** বা 'বক্র যুগ' বলা হয়েছে। আল্ কুরআন থেকে এ সময়ের দৈর্ঘ ১,০০০ বছর বলে জানা যায় (৩২ঃ৬)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যথাসময়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়ে পুনরায় ইসলাম তরীর হাল ধরলেন এবং একে সর্বপ্রকার শত্রুর হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের পরিকল্পনা সম্বলিত একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন ১৯০৫ সনে। নাম তার আল্ ওসীয়্যত। এতে তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের রসদ জোগানোর লক্ষ্যে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জেহাদ ঘোষণা করেন। এ জেহাদে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে খাঁটি মু'মিনের জীবন যাপনের পর তাদের পরিত্যক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বেশীর পক্ষে ৩ ভাগের এক ভাগ এবং কম পক্ষে ১০ ভাগের একভাগ ইসলামের সেবায় দান করতে হবে। আর এ অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্যে তিনি 'খেলাফত ব্যবস্থা'রও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। তিনি বলেন – যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্‌তাআলার বিধান ইহাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান, অর্থাৎ এখন ইহা সম্ভবপর নয় যে, খোদাতাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এ জন্যে আমি তোমাদিগকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয় কারণ তোমাদের জন্যে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন আর এই আগমন তোমাদের জন্যে শ্রেয়! কেননা, ইহা চিরস্থায়ী যার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সে কুদরত (অর্থাৎ খেলাফত) আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব ; খোদা তোমাদের জন্যে সে 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে (আল্ ওসীয়্যত ঃ ১৫ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে ইসলামী সংগঠনের হাতে ক্রমে ক্রমে প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ সংগৃহিত হবে। কোন প্রকার মনোকষ্টের সৃষ্টি হবে না, কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও করা হবে না; অথচ খেলাফতের হাতে প্রচুর অর্থ জমা হবে যদ্বারা ধনী ও দরিদ্রের চরম বৈষম্য দূর হবে। দারিদ্র বিমোচন হবে। আর শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্যেও খেলাফতকে কোন প্রকার বেগ পেতে হবে না। একটা স্বতঃস্ফূর্ত উৎসর্গের মাধ্যমে অনায়াসে বিরাট কাজ বিপ্লবাত্মকভাবে সুসম্পন্ন হবে। এটা যে শুধু কাকতালীয় কথা নয় বর্তমান বিশ্ব

আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে এখন আমরা তা-ই দেখতে পাচ্ছি।

তাহ্‌রীকে জাদীদ (নতুন ঘোষণা)-এর পটভূমি ঃ

পূর্বকথা ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাযিঃ) আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে ১৯৩৪ সনে একটি ঘোষণা দেন যা 'তাহ্‌রীকে জাদীদ' নামে খ্যাত।

তাহ্‌রীকে জাদীদ-এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর দ্বারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিম্নোক্ত কাশ্‌ফ (দিব্য-দৃষ্টি) ও পূর্ণতা লাভ করেছে ঃ

"কাশ্‌ফী অবস্থায় এই অধম দেখল যে, মানুষের আকৃতিতে দুই ব্যক্তি বসে আছেন। একজন মাটিতে অপরজন ছাদের কাছাকাছি। যে মাটিতে বসেছিল তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আমার এক লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন। সে চুপ থাকল। সে কোন উত্তর দিল না। আমি তখন ঐ ব্যক্তির দিকে মনোনিবেশ করলাম যে ছাদের নিকটবর্তী স্থানে আকাশের দিকে অবস্থা করছিল । সে আমার কথা শুনে বল্ল, এক লক্ষ পাবে না তবে পাঁচ হাজার দেয়া হবে। তখন আমি নিজে নিজে বল্লাম, যদিও পাঁচ হাজার খুবই কম তবে যদি খোদাতাআলা চাহেন কমসংখ্যক অধিক সংখ্যকের ওপর বিজয়ী হবে। এ সময়ে আমি এই আয়াত পড়ছিলাম–**কাম্‌মিন ফিয়াতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাসীরাতান বিইযনিল্লাহ** (কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বৃহৎ বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়) (সূরা বাকারাঃ ২৫০)। অতঃপর ঐ মনসুর কাশ্‌ফী অবস্থায় আমাকে দেখানো হলো এবং বলা হলো, স্বচ্ছল অবস্থা। স্বচ্ছল অবস্থা! কিন্তু খোদাতাআলার কোন গুপ্ত প্রজ্ঞা আমার দৃষ্টিকে উহা অনুধাবন করতে অক্ষম করে রাখল"।

(ইযালা-এ-আওয়াম ঃ প্রথম মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৯ টিকা)

আহরারী আন্দোলন ও তাহ্‌রীকে জাদীদ ঃ

১৯৩৪ সনের মাঝামাঝি জামাতের উপর এমন এক কঠিন দিনের সৃষ্টি হলো যে, জামাতে আহরার ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী শক্তি সমবেত হয়ে জামাতে আহমদীয়াকে এ দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। আহরারী আন্দোলনের নেতা মৌঃ আতাউল্লাহ্ বোখারী তো ঘোষণাই দিল যে, তারা কাদিয়ানকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেবে যেন কাদিয়ান ইটের সাথে ইট বাজিয়ে দেয় অর্থাৎ গুঁড়ো করে দেবে। অক্টোবর মাসে তারা এক কনফারেন্সও আহ্বান করল। এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে 'তাহরীকে জাদীদ' নামে একটি তাহরীক করা হলো।

এ তাহরীক আল্লাহ্‌কৃত সরাসরি নায়েলকৃত একটি তাহরীক। ১৯৩৪ সনের নভেম্বর মাসে হুযূর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট ধারাবাহিকভাবে দোয়া করতে করতে তাঁর তরফ থেকে সুসংবাদের আকারে এক স্বপ্নের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা তৈরী করেছি যা আগামী জুমুআ থেকে আমি বর্ণনা করা আরম্ভ করবো। এরপর তিনি কয়েকটি জুমআয় এই নতুন ঘোষণার পটভূমি রচনা করেন। তিনি জামাতকে আর্থিক কুরবানীর ব্যাপারে আরও তেজদীপ্ত করার জন্যে এবং কুরবানীর একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জামাতে কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে নির্দেশ দেন যা সংক্ষিপ্তভাবে এরূপ ঃ

(১) যে ব্যক্তির চাঁদা বাকী রয়েছে বা যে জামাতের চাঁদা বাকী রয়েছে তারা যেন সত্বর বকেয়া আদায় করে দিয়ে আগামীতে রীতিমত চাঁদা আদায়কারীর নমুনা পেশ করেন।

(২) যাদের মধ্যে মারামারি হয়ে কথা-বার্তা বন্ধ হয়েছে তারা যেন এ সপ্তাহের মধ্যেই নিজ ভাইয়ের নিকট মাফ চেয়ে শান্তি স্থাপন করে নেন এবং শিশা গলিত প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

(৩) জরুরী ভিত্তিতে আমার ঐ সকল লোকের দরকার যারা সেলসেলার প্রয়োজনে নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে প্রস্তুত, নিজের জীবনকে সংকটে ফেলতে প্রস্তুত, আর ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করতে প্রস্তুত।

বিস্তারিত পরিকল্পনার ঘোষণা ঃ

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৩৪ সনের ২৩শে নভেম্বর ৩০শে নভেম্বর ও ৭ই ডিসেম্বরের জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদ পরিকল্পনার বিস্তারিত বিষয়-বস্তু বর্ণনা করেন এবং ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ "তাহরীকে জাদীদ" হিসেবে ঘোষণাটির নামকরণ করেন।

তাহ্‌রীকে জাদীদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

তাহরীকে জাদীদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, আহমদীগণ যেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে আর খুব শীঘ্রই যেন দূর-দূরান্তে গিয়ে জামাতের কেন্দ্র তৈরী করে। তাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এ দিনগুলোতে ঘোষণা করেন ঃ

'যেহেতু ইহা প্রচার ও প্রসারের যুগ, আর আল্লাহ্‌তাআলা ইহা নির্ধারিত করেছেন যে, তিনি সমগ্র দুনিয়ায় আহমদীয়তকে বিস্তার করে দিবেন। এজন্যে যদি খোদাতাআলা বলে দিতেন যে, অমুক জায়গা উপযুক্ত সুতরাং আমরা সবাই সেখানে গিয়ে সমবেত হতাম এবং বাকী দুনিয়াতে আহমদীয়ত প্রচারে অমনোযোগী থাকতাম। তাই আজ খোদাতাআলা চাহেন যে, দুনিয়ার সকল স্থানে আমরা যাই এবং দুনিয়া ঘুরে ঐ স্থানে অন্বেষণ করি যা মদীনার অনুরূপ কাজ দেয়। এই উদ্দেশ্যে যদি আমরা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াই তাহলে সারা দুনিয়াতে আহমদীয়তের বীজ বপিত হয়ে যাবে। এভাবে খোদাতাআলার ইচ্ছাও পূর্ণ হবে যে, সারা দুনিয়াতে আহমদীয়তে বিস্তার লাভ করবে আর পরিশেষে আমাদের সেই স্থানও চোখে পড়বে যার অন্বেষণে আমরা বের হবো" (খুতবা জুমুআ ঃ ১৫-৩-১৯৩৫)

মোতালেবাত (দাবীসমূহ) ঃ

তাহ্‌রীকে জাদীদের পরিকল্পনা ১৯টি মোতালেবা (দাবী) সম্বলিত, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হযরত আকদস খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর পবিত্র ভাষার আলোকে নিম্নে বর্ণিত হলো। পরবর্তীতে এ মোতালেবা ২৭টি পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করেছে ঃ

১ম মোতালেবা ঃ

আজ থেকে তিন বছরের জন্যে প্রত্যেক আহমদী যারা আমার সাথে এ যুদ্ধে শামেল হতে চায় তাদের ইহা অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা আজ থেকে কেবল এক প্রকারের তরকারী খাবে। যদি মেহমান আসে তবে তার সম্মানার্থে একাধিক নূতন তরকারীর আয়োজন করা যেতে পারে। এ ছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র, অলংকারাদি প্রভৃতির ব্যাপারেও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে হবে। বাঙ্গালীদের জন্যে এক তরকারীর সাথে ডাল ব্যবহারের অনুমতিও তিনি দিলেন।

২য় মোতালেবা ঃ

জামাতের মধ্য থেকে এই ধরনের লোকেরা এগিয়ে আসুক যারা আগামী ৩ বছর পর্যন্ত নিজস্ব আয়ের কমপক্ষে পাঁচ ভাগ থেকে অধিক তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত সিলসিলার কাজের জন্যে চাঁদা দিতে থাকবে। এক কমিটি এ কাজ তদারকী করবে।

৩য় মোতালেবা ঃ

বিরুদ্ধবাদীদের কলুষতাপূর্ণ পুস্তকাদির জবাব তৈরী করা এবং প্রচার করা। এ কাজের জন্যেও জামাতের লোকদের নিকট থেকে ১৫,০০০/- টাকার একটি ফাণ্ড জমা করা হোক। এক কাজও একটি কমিটির নিকট সোপর্দ করতে হবে।

৪র্থ মোতালেবা ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া দরকার এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের তবলীগ করা দরকার।

৫ম মোতলেবা ঃ

তবলীগে ইসলামের একটি স্কীমের জন্যে জামাতের বন্ধুরা কমপক্ষে ৫/- টাকা করে ১,২০০/- টাকার একটি ফান্ড তৈরী করুক।

৬ষ্ঠ মোতালেবা ঃ

আমি চাই যে, যারা জীবন উৎসর্গ করতে আকাঙ্ক্ষী তাদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে বেছে নেয়া হোক। তারা সাইকেল যোগে সারা পাঞ্জাব ভ্রমণ করবে আর তবলীগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট দিবে।

৭ম মোতলেবা ঃ

তবলীগের কাজকে বিস্তার দেয়ার জন্যে সরকারী চাকুরীজীবীগণ তিন মাসের ছুটি নিয়ে তবলীগের জন্যে তাদেরকে পেশ করুন। এসব ব্যক্তিবর্গের জন্যে জরুরী হবে যে, তারা মালকানা অভিযানের ন্যায় নিজেদের খরচ নিজেরা বহন করবেন।

৮ম মোতলেবা ঃ

তিন বছরের জন্যে যেসব যুবক ইসলামের সেবায় জীবন ওয়াকফ(উৎসর্গ) করতে পারেন তারা যেন তা করেন।

৯ম মোতালেবা ঃ

যারা ৩ মাসের ছুটির সময় না দিতে পারেন তারা তাদের মৌসুমী ছুটির সময় ওয়াকফ করে দেন। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে তাদেরকে তবলীগ করতে বলা হবে।

১০ম মোতালেবা ঃ

বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক যেমন ডাক্তার,উকিল বা অন্যান্য সম্মানিত পেশার লোক যাদেরকে লোকেরা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে, তারা নিজেদেরকে পেশ করুন যেন তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে মোবাল্লেগের পরিবর্তে পাঠান যায় এবং তাদের দিয়ে জলসাসমুহে বক্তৃতা করানো যায়।

১১শ মোতালেবা ঃ

জরুরী কাজের লক্ষ্যে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রিজার্ভ ফান্ডে ৫০ লক্ষ টাকা জমা করার জন্যে সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে।

১২শ মোতালেবা ঃ

পেনশন প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সেলসেলার জন্যে যেন নিজেদেরকে পেশ করেন।

১৩শ মোতালেবা ঃ

সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়ার জন্যে কাদিয়ানে প্রেরণ করা হোক।

১৪শ মোতালেবা ঃ

এক কমিটি নিযুক্ত করা হোক। যারা তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে চান তারা তাদের সন্তানদের জীবন-বৃত্তান্ত ঐ কমিটির নিকট পেশ করুন যাতে কমিটি ঠিক করে দেন যে, ঐ ছেলে কিসে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে। এর কারণ এই যে, প্রত্যেক বিভাগে যেন আমাদের লোকেরা পারদর্শী হয়ে ওঠে বিশেষ কোন বিভাগে যেন আধিক্যের সৃষ্টি না হয়।

১৫শ মোতালেবা ঃ

যে সব বেকার যুবক বাড়ীতে বসে পিতা মাতার অন্ন ধ্বংস করে তাদের উচিত তারা যেন দেশ ছেড়ে বিদেশ পাড়ি জমায়। যাবার পূর্বে যেন খবর দিয়ে যায় যে, তারা কোন্ দেশে যাচ্ছে।

১৬শ মোতালেবা ঃ

প্রত্যেকের নিজের কাজ নিজে করার অভ্যেস সৃষ্টি করা দরকার। ইহা নিন্দনীয় নয় বরং সম্মানের কাজ। কাদিয়ানের লোকদেরকে বলা হচ্ছে তারা যেন পর্যায়ক্রমে দলে দলে কাদিয়ানের অলি গলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কর্মসূচী গ্রহণ করে।

১৭শ মোতালেবা ঃ

যারা বেকার রয়েছে এবং দেশের বাইরে যাওয়ার সঙ্গতি নেই তারা যেন বেকার বসে না থেকে ছোট থেকে ছোট কাজ করতে লেগে যায়।

১৮শ মোতালেবা ঃ

সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়ার কেন্দ্র কাদিয়ানে বাড়ী তৈরী করুন । কাদিয়ানকে আল্লাহ্তাআলা সিলসিলার স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

১৯শ মোতালেবা ঃ

দুনিয়ার উপকরণ যতই সংগ্রহ করা হোক না কেন তা দুনিয়ারই উপকরণ। আমাদের উন্নতির ভিত্তি এর ওপরে নয়। আমাদের উন্নতির ভিত্তি হলো আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপকরণের ওপর। তাই যারা উপরোক্ত মোতালেবাতের শর্ত পূরণ করতে অক্ষম তারা সিলসিলার উন্নতির জন্যে বেশী বেশী দোয়ায় লিপ্ত থাকেন।

মোতালেবাতের বৃদ্ধি ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ৫টি নতুন মোতালেবা ঘোষণা করেন জামাতের সামনে। মোতালেবাগুলো নিম্নরূপ ঃ

২০শ মোতালেবা ঃ

নিজ নিজ ধন-সম্পদ থেকে মহিলাদেরকে শরীয়ত মোতাবেক অংশ আদায় করুন।

২১শ মোতালেবা ঃ

মহিলাগণের অধিকার এবং আবেগ ও অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

২২শ মোতালেবা ঃ

প্রত্যেক আহমদী পরিপূর্ণভাবে আমানতদার (বিশ্বস্ত) হবে আর কারও আমানত খেয়ানত (অবিশ্বস্ততা) করবে না।

২৩শ মোতালেবা ঃ

খোদার সৃষ্টির সেবা করুন। নিজ হাতে কাজ করুন আর নিজে পরিশ্রম করে নিজের গ্রাম ইত্যাদিকে পরিচ্ছন্ন করুন।

২৪শ মোতালেবা ঃ

প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা উচিত যে, আগামীতে সরকার বাধ্য না করলে আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করবেন না। বরং নিজস্ব আদালতি বোর্ড ও কাযা বোর্ডে পেশ করবেন আর এর রায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করবেন।

২৫শ মোতালেবা ঃ

সন্তানদেরকে ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করুন। মনে রাখা দরকার যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজ সন্তান হযরত ইসমাঈল(আঃ)-কে কুরবানী করে উভয়ে আজও অমর হয়ে রয়েছেন।

(খুতবা ঈদুল আযহা ঃ ৯-১-১৯৪১)

২৬শ মোতালেবা ঃ

সম্পত্তি ও আয় ওয়াকফ করুন।
(আল্ ফযল ঃ১৩-৩-১৯৪৪)

২৭শ মোতালেবা ঃ

হিলফুল ফুযুলের ন্যায় সমিতি গঠন করুন।
(খুতবা জুমুয়া ঃ ২২-৭-১৯৪৪) (চলবে)।

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী

হযরত মুসলেহ মাওউদ কর্তৃক বর্ণিত

উহুদের যুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, তাহলে আর পরওয়া কিসের ? আঁ হযরত (সঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে সৈনিকদের ফেরার পথে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য মদীনা শহর থেকে এক মহিলা বের হয়ে আসেন এবং এক এক করে সৈনিককে জিজ্ঞেস করেন আঁ হযরত (সঃ)-এর অবস্থা কী ? যেহেতু তিনি জীবিত এবং সুস্থ অবস্থায় ফিরছিলেন আর সৈনিক সে দিকে নিশ্চিত যে, সেই মহিলার জবাব সঠিক দেয়া হয় নি। সৈনিক বলেন, তোমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। মহিলা বলেন, আমি তো জিজ্ঞেস করছি যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর অবস্থা কী ? সৈনিক বলেন, তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে। মহিলা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করছি যে, আঁ হযরত (সঃ) কেমন আছেন ? তিনি বললেন, তোমার ভাই মারা গেছেন। মহিলা বলেন, আমি তো তোমার নিকট এসব জানতে চাচ্ছি না। আমি তো জানতে চাচ্ছি , আঁ হযরত (সঃ)-এর অবস্থা কী ? তখন সৈনিক বললেন, তিনি তো ভালই আছেন। মহিলা বললেন, তিনি যখন ভাল এবং জীবিত আছেন, তারপর আর চিন্তা কিসের ,পরোয়া কিসের ? (খুতবাতে মাহমুদ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২০৯)।

মাটির বস্তা

সাহাবা (রাযিঃ)-এর একটি দল একবার ইরানের বাদশাহ্‌র নিকট যায়। বাদশাহ্ বলেন, তোমরা টাকা নিয়ে নাও আর চলে যাও। তোমাদের প্রত্যেক সৈনিকের জন্য এক পাউন্ড আর প্রত্যেক অফিসারের জন্য দুই পাউন্ড করে দিব। তোমরা এই অর্থ নিয়ে চলে যাও। দলপতি জবাবে বলেন, নিঃসন্দেহে এটা ভাল। এক সময় এমনই ছিল, যখন আমরা মুসলমান হই নি। এখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একথা শুনে বাদশাহ্ ক্রোধান্বিত হয়ে খাদেমদেরকে বলেন, মাটির বস্তা নিয়ে এসো, আর অপদস্থ করার জন্য তাদের প্রত্যেকের মাথায় একটি করে মাটির বস্তা দিয়ে দাও। এছাড়া আর কিছু দেয়া যেতে পারে না কিন্তু যাদের তারা মুখ এবং উটের দুগ্ধপায়ী মনে করতো। আজ আল্লাহ্‌তাআলা অশেষ অনুগ্রহ দ্বারা তাদের জ্ঞান দান করেছেন। তারা জানতো যে, মুশরিকরা এমনি হয়। সেই জন্য মাটির বস্তা তাদের মাথায় তুলে দেয়। তখন তারা নিজ সঙ্গীদের বলেন, চল এখন আমরা চলি। সুতরাং তারা মাটির বস্তা মাথায় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল এবং বললো, ইরানের বাদশাহ্ নিজ হস্তে ইরানের মাটি আমাদের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছেন। তারপর বাদশাহ্ সরদারকে আদেশ দিলেন, তাদেরকে আটক কর আর যে প্রকারেই হোক এই মাটি ফেরত নিয়ে এসো। ততক্ষণে তারা অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন (খুতবাতে মাহমুদ, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৪৬১)।

দোষ আমার ছিল

একদা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এবং হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মধ্যে কলহ ঘটে যায়। হযরত উমর (রাযিঃ) মনে করলেন, এ খবর হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর নিকট যদি পৌছে তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। অপর দিকে কোন ব্যক্তি জানায়, হযরত আবুবকর (রাযিঃ)-কে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর খেদমতে যেতে দেখেছেন। অথচ হযরত আবুবকর (রাযিঃ) সেই সময় বাড়ী যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর নিকট যান নি। আর হযরত উমর (রাযিঃ) দৌড়িয়ে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর খেদমতে পৌছেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আজ আমার একটি ভুল হয়ে গেছে। আমি আবুবকরের সঙ্গে ঝগড়া করে ফেলেছি। ইত্যবসরে কোন এক ব্যক্তি হযরত আবু বকরের নিকট গিয়ে জানায়, হযরত ওমর হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর নিকট গিয়েছেন। জানি না তিনি তাঁর নিকট কীরূপ বর্ণনা করেছেন।

এদিকে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌছেন এবং হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত হন।

যখন তিনি দরজার নিকটে পৌছেন তিনি দেখলেন হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর চেহারা একেবারে অগ্নিশর্মা এবং তিনি হযরত উমরের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছেন, হে লোক সকল ! তোমরা কি পেয়েছ, আমার এবং এই ব্যক্তির পশ্চা ছাড়বেনা, যে ব্যক্তি এমন সময় আমাকে গ্রহণ করেছেন যখন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বক্রতা ছিল। আজ সেই ব্যক্তি অসুস্থতাবস্থায় এসে বলছিলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কসূর মেরা যা অর্থাৎ দোষ আমার ছিল। ইতোমধ্যে হযরত আবুবকর (রাযিঃ) অগ্রসর হয়ে দুই হাঁটু ভাজ করে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়েন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! উমরের দোষ নেই, দোষ আমার ছিল। (খুতবায়ে মাহমুদ, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৮৪)

বেহেশ্‌তবাসীরা সবাই যুবক হবেন

আঁ হযরত (সঃ)-বলেন যে, হাসি আমিও করে থাকি। তবে এর মধ্যে মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে না। একবার হুযুর (সঃ) উপবিষ্ট আছেন এমন সময় একজন বৃদ্ধা তাঁর নিকট আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি কী জান্নাতে যেতে পারব ? হুযূর (সঃ) বলেন, কোন বুড়া-বুড়ী জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা তাঁর কথা শুনা মাত্র কান্না শুরু করেন। তখন রসূল (সঃ) বলেন, আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয়, যারা দুনিয়ার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তারা জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং এই ছিল উদ্দেশ্য যে, সকলেই যৌবনাবস্থায় জান্নাতে থাকবে।

খোদার উপর ভরসা করে

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর বিবি হাজেরাকে তাঁর শিশু সহ জংগলে রেখে আসেন তখন হাজেরা জিজ্ঞেস করেন, আপনি আমাকে এখানে কিসের ভরসা করে ছেড়ে যাচ্ছেন। সেখানে না আছে পানি না আছে খাদ্য না আছে কোন সঙ্গী সাথী এবং সাহায্যকারী। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, আমি খোদার উপর ভরসা করে তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি। তিনি (হাজেরা) বলেন, আচ্ছা তাহলে যান এখন আমার আর কোন পরোয়া নেই। আমাদের জন্য আমাদের খোদাই যথেষ্ট। পানির একটি মশকে হযরত ইব্রাহীম (সঃ) যা রেখে এসেছিলো সেই পানি শেষ হয়ে গেলে আর ইসমাঈল পানির জন্য পিপাসায় কান্না করতে থাকলে আর সেখানে আশে পাশে পানি না পাওয়াতে শিশুকে পানি পান করার জন্য তিনি ছুটাছুটি করতে থাকেন। কিন্তু সেখানে পানি কোথায়। দৌড়া-দৌড়ি করে শূন্য হাতে শিশুর নিকট আসেন এবং তিনি ঘাবরিয়ে যান। শিশুর অবস্থা দেখে তিনি আবারও ছুটাছুটি করতে শুরু করেন।

পরিশেষে এক ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, একটি নহরের সন্ধান মিলেছে। তিনি সেই স্থানে যান এবং নহর দেখতে পান যাকে আবে জম জম বলা হয়। আঁ হযরত (সঃ) বলেন যে, যদি হাজেরা এই নহরকে না আটকাতেন তা হলে ইহা দূরদূরান্তে বিস্তার লাভ করত (খুতবাতে মাহমুদ– পৃষ্ঠা ৪)।

সংগ্রহ ঃ **ডাঃ হেলাল উদ্দীন আহমদ** দৈনিক আল্ ফযলের ২৭শে জুন ১৯৯৮-এর সৌজন্যে

মিনহাজুত্‌তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(২৪তম কিস্তি)

এখন আমি ঐসব পুণ্য কর্মের কথা বলবো, যা মানুষের সাথে সর্ম্পক রাখে -

(১) ন্যায়-বিচার, (২) অনুগ্রহ, (৩) কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, (৪) পরিচ্ছন্নতা পসন্দ করা, (৫) দান করা, (৬) বিশ্বস্ততা, (৭) কার্যতঃ করুণা করা, (৮) বন্ধুত্ব, (৯) সহিষ্ণুতা। এর অর্থ এই যে, যদি কারও কোন ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে তার ভাল দিকটি সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে তাকে ছেড়ে দেয়া। উপেক্ষা তো ইহাই যে দোষী জানা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়া। কিন্তু সহিষ্ণু অর্থ এই যে, তার গুণাবলীর কারণে উপেক্ষা করা, (১০) পরোপকার, (১১) টাকা-পয়সা ধার দেয়া, (১২) সদকা, (১৩) সহযোগিতা, (১৪) বিশ্বস্ত হওয়া, (১৫) সন্ধি স্থাপন অর্থাৎ সন্ধির চেষ্টা করা, (১৬) উপেক্ষা অর্থাৎ ক্ষমা করে দেয়া, (১৭) অঙ্গীকার রক্ষা করা, (১৮) নিম্নস্তরের লোকদের উন্নীত স্তরে উঠানোর চেষ্টা করা, (১৯) অন্যান্যদের মান-সম্মান প্রদান করা (২০) অন্যদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন অর্থাৎ বয়স ও মর্যাদায় বড়দের দেখানো, (২১) যদি লোকেরা ঝগড়া করে তাহলে তার মীমাংসা করে দেয়া, (২২) ভ্রাতৃত্ব, (২৩) গোপনীয়তা রক্ষা করা ও (২৪) প্রফুল্লতা।

এখন আমি ঐসব পুণ্য কর্মের কথা বলছি, যা অন্যান্য জীব-জন্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে ঃ

(১) তাদের খাবারের প্রতি দৃষ্টি রাখা, (২) তাদের সামর্থ্যানুযায়ী তাদের থেকে কাজ নেয়া, (৩) যেসব জন্তু কাজে আসে না তাদেরকেও খাদ্য দেয়া। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একবার কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিলো এবং পাখীরা খাবার পাচ্ছিলো না। এক ব্যক্তি ওদের খাবার দিলেন। এ কারণে তার ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হয় এবং তিনি বেহেশ্‌তে চলে যান। কুরআন করীমেও এসেছে **ওয়াল্লাযীনা ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুম্‌ মা'লুম-লিস্‌সাঈলিওয়াল মাহ্‌রুম**-আর তারা (ব্যতিরেকে), যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্দিষ্ট হক্ ও অধিকার, তাদের জন্যেও যারা (সাহায্য) চাইতে পারে এবং তাদের জন্যেও যারা চাইতে পারে না (সূরাতুল মা'আরিজ ঃ ২৫-২৬)। মু'মিনদের ইহাও একটি গুণ যে, তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে তাদেরও অংশ রয়েছে যারা চাইতে পারে আর যারা চাইতে পারে না তাদেরও অংশ রয়েছে। যারা চাইতে পারে না তাদের মধ্যে জন্তু জানোয়ার ও পাখীও অন্তর্ভুক্ত। তাদেরও খেতে দেয়া উচিত, (৪) বোবা পশুদের শীতাতপ এবং তাদের যৌন আবেগ ও তাদের শাবকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

এখন আমি ঐসব পুণ্য কর্মের বর্ণনা করবো, যা জাতীয় পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত ঃ

(১) যাকাত দেওয়া, (২) জাতীয় প্রয়োজনে চাঁদা দেয়া, (৩) অতিথিদের সেবা করা, (৪) জাতির সেবা করা, (৫) সরকারের প্রতি আনুগত্য করা, (৬) সরকারের সাথে সহযোগিতা করা (৭) দেশের হেফাযত করা, (৮) দায়িত্বের অনুভূতি, (৯) ভুলের জন্যে আনন্দে শাস্তি মেনে নেয়া, (১০) ভাল কাজের প্রচার অর্থাৎ লোকদের মধ্যে পুণ্যকে বিস্তার দেয়া, (১১) শত্রু জাতিকে এড়িয়ে চলা, (১২) জাতীয় মান-মর্যাদা সংরক্ষণ করা, জাতির বিরুদ্ধে যদি কেউ অপমানজনক কথা বলে তাহলে তার প্রতিবাদ করা, (১৩) ব্যবসায় সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা, (১৪) শিক্ষা দেয়া, (১৫) সচ্চরিত্র গঠন করা।

এখন আমি ঐসব পুণ্য কর্ম সম্বন্ধে বলবো, যা আল্লাহ্‌তাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে ঃ (১) ঈমানে উৎকর্ষ লাভ করা, (২) ঐশী-প্রেম, (৩) শরীয়তের বিধি-বিধান পালন। ইবাদত ও আচার-ব্যবহারে পরিপূর্ণতা লাভ করা, (৪) খোদার নিকট আশা পোষণ করা, (৫) ভীতি অর্থাৎ খোদাতাআলার পবিত্রতাকে ভয় করা, (৬) আন্তরিক পবিত্রতা, (৭) ভরসা অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এ অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে, খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসলে পরে সফল হবো, (৮) উত্তম চরিত্র, যা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখা যেভাবে অঙ্গীকার পালন ইত্যাদি, (৯) সর্বপ্রকার মিথ্যা বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, (১০) আল্লাহ্‌তাআলার মর্যাদার সাথে যদি কেউ বেআদবী করে যেমন, কেউ বলে, তিনি আমাকে কী দিয়েছেন, আমার ওপরে বড়ই অন্যায় করা হয়েছে তখন তাকে বুঝানো দরকার যে, ইহা খোদাতাআলার সম্মানের পরিপন্থী। এথেকে বিরত থাকো, (১১) সত্যের প্রচার। আল্লাহ্‌র চিহ্নাবলীর (যা দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়) সম্মান করা।

এখন আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলবো যে, কোন্ কোন্ উপলক্ষ্যে এসব কর্ম পালন ও পরিত্যাগ করা যায়। এর দু'টি উত্তর। একটি সংক্ষিপ্ত, অপরটি বিস্তারিত। যদি বিস্তারিত উত্তর দিতে চাই তাহলে সংক্ষিপ্ত করে বল্লেও ১৫/২০ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। এজন্যে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টির মোটামুটি কথাগুলো বর্ণনা করছি ঃ

(১) এসব অধিকার যা বান্দার ওপরে আল্লাহ্‌র রয়েছে ঐ সময় পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না বাধ্য করা হয় বা খোদাতাআলার অন্য আদেশ উহার পথে প্রতিবন্ধক না হয়। যেমন, হাতে বা মুখে আঘাত যে এ কারণে ওযু করতে পারে না বা হাতই উঠিয়ে ধুতে পারে না। ইহা বাধ্যবাধকতা। আর এর বিপক্ষে দ্বিতীয় উদাহরণ এই এসে যায় যে, খোদাতাআলার আদেশ এই যে, মহিলারা পর্দা করবে কিন্তু ইহাও খোদার আদেশ যে, হজ্জের উপলক্ষ্যে খানা কা'বাতে পর্দা উন্মোচন করে দেয়া আবশ্যক। এ দ্বিতীয় আদেশটি প্রথম আদেশের বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে আর এ কারণেই খা'না কা'বাতে পর্দা না করা পুণ্যের কাজ। অথবা এ উদাহরণ যে, পিতা-মাতার আনুগত্য করো। ইহা পুণ্যের কাজ। কিন্তু যদি পিতা-মাতার কোন আদেশ খোদাতাআলার আদেশের বিরোধী হয় তখন উহা না মানাই পুণ্যের কাজ হবে। (২) অন্যের বেলায় এমন কোন কথা না বলা যে, যা ঐ অবস্থায়ই বলা নিজের জন্যে পসন্দ করে না। আমি এতে একটি শর্ত আরোপ করছি আর তা এই যে, আমি একথা বলছি না যে, অন্যের সাথে সেই আচরণ করুক যা সে পসন্দ করে। বরং আমি একথা বলি যে, অন্যের সাথে এমন কোন কথা যেন বলা না হয় যা ঐ অবস্থায়ই নিজের জন্যে

পসন্দ করে না বা অন্যের সাথে যেন এমন আচরণ না করে যা ঐ অবস্থায়ই নিজের জন্যে পসন্দ করে না। ইঞ্জীলের আদেশ এইঃ তুমি অন্যের সাথে তেমনই আচরণ করো যেভাবে নিজের জন্যে পসন্দ করো। কিন্তু এ আদেশ সঠিক নয়। (৩) বাড়াবাড়ি না করার প্রতি দৃষ্টি দেয়া। কতক লোক এরূপ হয়ে থাকে যে, হয়তো তারা নফল পড়াই ছেড়ে দেয় নয়তো এতই পড়া শুরু করে দেয় যে, সংসারের চিন্তাই পরিত্যাগ করে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তির প্রসঙ্গে অভিযোগ করা হলো যে, সে দিনে রোযা রাখে এবং রাত ভর নফল পড়তে থাকে। তিনি (সঃ) তাকে বল্লেন - **ওয়া লি নাফসিকা আলায়কা হাক্কু** অর্থাৎ তোমার আত্মার তোমার উপরে অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীরও তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে। উহাও আদায় করা আবশ্যক।

(৪) মানুষ এমনভাবে যেন সৎকর্ম করে যাতে তার মধ্য দিয়ে খোদাতাআলার গুণ বিকশিত হওয়ার ফলে তেমনই রূপ সৃষ্টি হয়ে যায়।

এখন আমি তৃতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে আলোকপাত করবো। কীভাবে অবগত হওয়া যাবে যে, মানুষের মধ্যে কোন্ কোন্ দোষ-ত্রুটি নিহিত রয়েছে। ইহা অবহিত হওয়ার কতিপয় মাধ্যমে রয়েছে।

(১) আত্ম বিশ্লেষণ। যখন মানুষের ইহা জানা হয়ে যায় যে, ইহা ভাল উহা মন্দ। তখন যদি সে চিন্তা করে যে, কী কী মন্দ তার মধ্যে রয়েছে বা কী কী ভাল তার মধ্যে রয়েছে তাহলে জানতে পারে। (২) কতিপয় নিজের কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলে, সে যেন তার সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করে। কেননা, মানুষ কখনও নিজের ত্রুটি নিজে জানতে পারে না। এজন্যে বন্ধুকে বলে, সে যেন তার বাহ্যিক কর্মগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে। ইহা যেন না বলে যে, তুমি আমার ব্যাপারে দোষ-ত্রুটিগুলোকে বিশেষভাবে অন্বেষণ করো। ইহা পাপ। বরং বলে যে, বাহ্যিক কর্মসমূহ রয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো এবং যে দুর্বলতা পাও সে সম্বন্ধে বলো। এভাবে যেসব দুর্বলতার ব্যাপারে সে জানতে না পারতো ওগুলো সম্বন্ধে তা বন্ধু বলে দেবে। কিন্তু এর পরেও বন্ধ বন্ধুই থাকে। কতিপয় দোষ-ত্রুটি সে-ও এড়িয়ে যাবে, এজন্যে তৃতীয় পদ্ধতি ইহা অবলম্বন করা উচিত- যেসব দোষ-ত্রুটি সে অন্যের মধ্যে লক্ষ্য করে থাকে সেগুলোর ব্যাপারে দেখে যে, ওগুলো আমার মধ্যে তো নেই? আমি তো ঐসব কর্ম করি না? অথবা অন্যদের মধ্যে যেসব পুণ্যকর্ম পরিলক্ষিত হয় ওগুলোর ব্যাপারে দেখে যে, ওগুলো আমার মধ্যে আছে কি নেই। (৪) এথেকে বেশী আরও একটি কথা রয়েছে আর তাহলো এই ঃ শত্রু তার ওপরে কি দোষ-ত্রুটি আরোপ করে থাকে এবং পরে চিন্তা করে যে, ঐ দোষ-ত্রুটি তার মধ্যে আসলেই আছে কি নেই। কতক দোষ-ত্রুটি এভাবে জানা হয়ে যাবে। এভাবে ইহাও দেখে যে, শত্রুর মধ্যে এমন কোন পুণ্য পরিদৃষ্ট হয়-কখনও কখনও এমন হয়ে থাকে যে, পুণ্যসমূহকে চিনবার জন্যে শত্রুও বাধ্য হয়ে যায়।

(৫) ভাল ও মন্দসমূহকে জানার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অধিকতর উত্তম পদ্ধতি এই যে, কুরআন করীম তেলাওয়াত করার সময় যেখানে ঐসব দোষ-ত্রুটির কথা পাঠ করে যা খোদাতাআলা প্রাথমিক যুগের জাতিরসমূহের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন সেখানে যেন চিন্তা করে যেন আমার মধ্যে ঐ দোষ-ত্রুটি তো নেই। এভাবেই কুরআন করীমে যখন কোন পুণ্য কর্মের উল্লেখ আসে সেখানে দেখে যে, আমার মধ্যে এ পুণ্য কর্ম পাওয়া যায় কি যায় না। এর একটি কল্যাণ ইহাও হবে যে, যেহেতু সব পুণ্য ও মন্দ কর্ম-একই সময়ে মানুষের সমক্ষে আসতে পারে না এজন্যে আস্তে আস্তে তেলাওয়াতের সময়ে আসতে থাকবে। দ্বিতীয়বার তেলাওয়াতের সময় যেহেতু আল্লাহ্-ভীতি সৃষ্টি হয় এজন্যে মন্দ কর্ম থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এবং পুণ্য অবলম্বন করাতেও এতদ্দ্বারা সাহায্য লাভ করে। (চলবে)

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আমি এক ফেরিওয়ালা বলছি

আমি এক ফেরিওয়ালা বলছি। একজন ফেরিওয়ালার জীবন এবং তার কর্মকান্ডকে চিনে না-জানে না এমনটি কেউ আছেন বলে বিবেচিত হয় না। তারা কাঁধে কিংবা মাথায় বহে রকম সকম হাঁক ডাকে শহর গঞ্জের অলিতে গলিতে বিবিধ মালামাল বিক্রি করে জীবন ধারণ করে। সেখানে ক্রেতা সস্তায় সদায় কিনেছে ভেবে আশ্বস্ত হন আর বিক্রেতা তা লাভে বিক্রি করেছেন জেনে প্রফুল্লতা বোধ করেন। ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবেই জাগতিক। আমিও তাদের অনুরূপ এক ফেরিওয়ালা বটে তবে আমার বিক্রির জন্য নির্বাচিত পণ্য সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। এখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়জনই প্রভূত লাভবান হন। আমার যে পণ্য তা কোন ক্রেতাকেই অর্থ বিনিময়ে কিনতে হয় না। অথচ এই পণ্যের প্রয়োজন নেই এহেন মানুষ পৃথিবীতে একটিও নেই। প্রতিটি ক্রেতারই তা ক্রয় করা অতীব প্রয়োজন। জীবন বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ ক্রয় করা সুকঠিনভাবে জরুরী, যিনি এই অমূল্য সম্পদ ক্রয়ে ব্যর্থ হবেন তার জীবন নিশ্চিতভাবে মূল্যহীন এবং এর পরিণতি বড়ই ভয়ঙ্কর। স্রষ্টার উদ্দেশ্য সাধন ক্ষেত্রে এ জীবনের অবদান একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। যে সম্পদ অর্জনে ব্যর্থতার কারণে জীবনের এমনিতর জঘন্য পরিণতি আমি সেই সম্পদই ফেরি করে বেড়াই অথচ প্রতিটি ক্রেতার কাছেই আমি উপেক্ষিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত ও অবহেলিত। আমি দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে বিনামূল্যে সেই সম্পদ বিলাতে চাই। কিন্তু কেউ আমাকে হাঁকে না, ডাকে না, সাদরে আলিঙ্গণ করে না, বরঞ্চ তাচ্ছিল্যের সাথে উপেক্ষা করে এবং লাঞ্ছনা করার চেষ্টা করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমার সকাশে এমন কি সম্পদ রয়েছে যা ক্রেতাগণকে ক্রয় না করলেই নয় ? এই সম্পদ বিনে কেন জীবনসমূহের এমনিতর কুৎসিৎ পরিণতি হবে ? হাঁ, এ সম্পদ অবশ্যই অসাধারণ মূল্যবান, আত্মার পবিত্র খাদ্য এবং স্বর্গ দওয়াজায় গৃহীত হওয়ার অর্থাৎ, জাগতিক মোহ থেকে আত্মরক্ষার এক অমূল্য রত্ন। মূলতঃ সেই সম্পদ হচ্ছে, নবী শ্রেষ্ঠ আঁ হযরত (সঃ)-এর পুণ্যময় নির্দেশ, ইসলামের পরিপূর্ণ আদর্শ এবং বিশ্বব্যাপী কুরআনী সওগাত বিতরণের এক মহা দায়িত্ব। আর এই গুরুভার আজ যাঁর উপর ন্যস্ত তিনি হলেন আখেরী যামানায় আগত ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহে মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)। আমি এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং তাঁরও পিতা দীর্ঘ প্রায় শত অব্দ অধিক সময় ব্যাপী স্বর্গ থেকে আগত সেই পুণ্যময় আত্মার আগমনের শুভ বার্তাই ফেরি করে বেড়াচ্ছি, যা কেবল মুসলমানগণের জন্যই নয়, বরং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ সকল নামী-বেনামী ধর্মানুসারীর সর্বস্তরের প্রত্যেককেই বাধ্যতামূলকভাবে ক্রয় করতে হবে। যেজন এই প্রদেয় শর্তের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তার আর সব ক্রয়কৃত সম্পদই অভিসম্পাতে পরিণত হবে। তার সযত্নে গড়া ঈমান এবং আমল আদৌ তার কোন কাজে আসবে না। শেষটায় তাকে কপর্দকহীন হাতে নির্মম হতাশায় হাশরাসরে উপস্থিত হ'তে হবে। কারণ তিনি স্বীয় পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে

অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজেই ধর্ম আজ তার হাতে বিপন্ন। সুতরাং তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ফলে তার ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জীবনের সবটুকু অধ্যায়ই বিনাশ প্রাপ্ত হবে, যা আর কোনভাবেই পরিশুদ্ধ করে নেয়ার অবকাশ থাকবে না। এখানে জেনে রাখা দরকার যে, ইহা আমার মত নগণ্য এক ফেরিওয়ালার উক্তি নহে, প্রকারান্তরে ইহা অতীতে সকল জাতিতে আগত সকল রসূল-পয়গম্বরগণেরই ইঙ্গিত বাণী। আর এ প্রসঙ্গে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রসূলে আকবর (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মানিয়া মারা যাইবে সে জাহিলিয়তের মৃত্যু বরণ করিবে" (মুসনাদ)। তদ্রূপভাবে পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য হচ্ছে, **'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকু বিহিম'** (অনুবাদ) এবং (তিনি তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্যদের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই" (৬২ ঃ ৪)। পক্ষান্তরে এতদুভয় সত্য সিদ্ধান্তকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে আমার অভীষ্ট লক্ষ্য, আমার ফেরি করা পণ্য। সুতরাং হে তথাকথিত ধর্ম সেবকগণ! তোমরা আমার সান্নিধ্যে না এসে, আমার কর্মকে ধর্মের মানদন্ডে পরিপূর্ণভাবে পরিমাপ না করে, আমার প্রস্তাবিত পথ ও মতকে হৃদয়ের নম্রতা ও কোমলতা দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ না করে শয়তানী স্বভাব সুলভে উত্তেজিত হয়ে গর্জে উঠো না, প্রতিহিংসার তাড়নায় রেগে গিয়ে গালমন্দ দিতে তৎপর হয়ো না আর আমাকে অমুসলমান বানাবার চেষ্টা করে স্বীয় আত্মার উপর নৃশংস অত্যাচার করো না। কারণ এমনিতর হীন কার্য সাধন কদাচ কোন আদর্শবান, ধর্মপ্রেমিক, তাওয়াহীন আত্মার কম নহে, বরঞ্চ তা নিছক প্রথম স্তরের আত্মার কুকর্ম বলেই যুগে যুগে স্বীকৃত। অতীত কালে নমরূদ, ফেরাউন, আবূ জাহল এবং বর্তমান যুগে আলেকজান্ডার ডুই, পন্ডিত লেখরাম এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর মত আ-তেল ব্যক্তিগণ অনুরূপ কর্ম-সাধন করে তাদের আত্মাকে নিদারুণভাবে নিন্দনীয় করেছে। ফলে তারা 'সত্যের শত্রু' উপাধি পেয়ে কালের সাক্ষী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে এ প্রসংগে রহমান খোদা এরশাদ করেছেন, **"ফাল্ ইয়াওউমা নুনাজ্জিকা বি বাদানিকা লিতাকুনা লিমান্ খালফাকা আয়াতান"** অর্থাৎ– অতএব, আজ আমরা তোমাকে (প্রসংগঃ ফেরাউন) শুধু তোমার দেহ দ্বারাই রক্ষা করিব, যাহাতে তুমি পরবর্তীগণের জন্য এক নিদর্শন হও (সূরা ইউনুস, রুকূ–৯)।

সুতরাং হে ভাই! তোমরাও যেন পুনশ্চ অমনটি করো না। বরং ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করে পরিত্রাণ প্রত্যাশী হও। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন বলে, **"ফাল্লাযীনা আমানূ ওয়া আমেলুস্‌সলিহাতি লাহুম্মাগফিরাতু ওয়া রিযকুন্ কারীম"** অর্থাৎ –যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক (সূরা হাজ্জ, রুকূ–৭)।

অবশেষে আমি আমার লেখার এই অংশে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীর সৌজন্যে হৃদয় উজাড়ে তুখোড় কণ্ঠে এই কথাই বলতে চাই যে, হে জগদ্বাসী ! বর্তমানে কান্ডারিহীন ইসলামের সংস্কারক হিসাবে দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কাদিয়ানী খোদা ও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সঃ)-এর সনদপ্রাপ্ত রসূলের পুণ্যে কল্যাণমন্ডিত এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর দ্বারা বিশ্বময় ইসলাম বিজয় লাভ করবে ইহাই খোদাতাআলার সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন, কারো হুমকি এবং ধমকিতে ভীত হয়ে এই জামাতের চলমান কর্মসূচীকে তিলার্ধ পরিমাণও পরিবর্তন করা হবে না। কারণ স্বয়ং খোদার নির্দেশনায় এই জামাতের প্রণীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত না জগতের বুকের প্রতিটি মানুষ পবিত্র কলেমার সত্যতার সপক্ষে সাক্ষ্য দিবে এবং পৃথিবীর তাবৎ সব ধর্মের অসারতা প্রমাণিত হবে ততদিন পর্যন্ত জামাতে আহমদীয়ার এই অদম্য কর্মান্দোলন চলতেই থাকবে। তবে যে দুর্ভাগা এই সত্য গ্রহণে নিবিষ্ট মনে চিন্তাশীল হবে না সে স্বহস্তে স্বীয় আত্মার মুক্তির দ্বার খিলবদ্ধ করে মরবে। হায়, সতত পরিতাপ ! সেই তাকওয়াশূন্য আত্মার জন্য যাকে শত অনুরোধে, শত চেষ্টায় শত সহস্র বার বুঝিয়ে বলার পরও এমন নির্মল সত্যকে গ্রহণ না করেই মৃত্যু বরণ করল।

অতএব, স্বীয় আত্মার সেবক ব্যক্তিবর্গের সমীপে আমার শেষ কথা এই যে, আপনারা বড়ই ভাগ্যবান, কারণ আপনাদের জীবদ্দশায় সেই পুণ্যবান পুরুষের নাগাল পেয়েছেন এবং তাঁর দাবীর শুভ সংবাদও শ্রবণ করেছেন। সুতরাং আর বিলক্ষণ বিলম্ব নয়। স্ত্রী-পুত্র স্বজনকে সাথে করে দ্রুত ছুটে আসুন এবং তাঁর পবিত্র হস্তে বয়াত গ্রহণ করে জান্নাত লাভের দাবীদার হউন। ইত্যবসরে বহু সময় পার হয়ে গিয়েছে বরং পুণ্য-সম্ভার ক্রয় করতে গিয়ে আপনি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। কাজেই এ ব্যাপারে আর চিন্তা-ভাবনা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআন বলে **"আফালাম তাকূনূ তা'কিলুন,** (অর্থ) তোমরা কি বুদ্ধিমানদের অন্তর্ভুক্ত হবে না যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়"? (৩৬ঃ৬৩) ইহা আপনাদের জ্ঞাত সত্য যে, দৃষ্টি-শক্তি থাকা সত্ত্বেও যেমন আপনি আলোর উপস্থিতি ছাড়া দেখতে পান না, তেমনিভাবে স্বর্গ হতে কোন আধ্যাত্মিক আলোর আগমন ছাড়াও মানুষ আত্মার উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় না। আর হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-ই হলেন স্বর্গ থেকে আগত সেই আধ্যাত্মিক আলো যাঁর সংস্পর্শে এসে আপনি আপনার কাংখিত পথের সন্ধান পাবেন। তিনি বলেছেন, "হে লোকসকল ! আমি আমার প্রিয় রসূল (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মতে তোমাদের জন্য অঢেল রত্নসম্ভার নিয়ে এসেছি, তোমরা আমার সান্নিধ্যে আস এবং সেসব আমার নিকট হ'তে সংগ্রহ করে লাভবান হও নচেৎ ইহা নিশ্চিত সত্য যে, তোমাদের আশা ও ভরসা নিরাশায় পরিণত হবে। কারণ সমাগত সত্যের শত্রু হয়ে কেউ কোন দিন পরিত্রাণ পায় নি কাজেই তোমরাও পাবে না বরং অধিক কল্যাণকর ইহাই যে, তোমরা আমার সাহায্যকারী হও, তবেই খোদা তোমাদের হবেন, বিপদে তোমরা ঘুমন্ত থাকবে কিন্তু তোমাদের খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকবেন। ইহা মোটেই আমার কথা নয়, বরং ইহা আমার সাথে খোদার অঙ্গীকার এবং তা নিখাদ সত্য"। সুতরাং হে বিরুদ্ধবাদী বন্ধুগণ ! আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এই কথাই বলতে চাই যে, উদাত্ত এই আহ্বানকে হৃদয় দিয়ে বিবেচনা করুন। কারণ আকাশের রবি-শশী-তারকা যমীনের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত এবং স্বর্গের ফিরিশ্‌তা পর্যন্ত নানানভাবে বর্ণিত এই সত্যের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে আসছেন, তাই আর অবহেলা নয়, পক্ষান্তরে আপনার অবহেলার পরিণাম হবে ইহাই যে, জগত আরও ভয়ঙ্কর তান্ডবে হেস্ত-নেস্ত হবে। কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে, তাতে কেবল অজস প্রাণ সংহারই ঘটবে, পরিণামে তা-ই হবে যা খোদা ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আপনাদের পূর্ব-পুরুষের অনেকেই এই পবিত্র যুগ প্রাপ্তির লালসা নিয়ে মৃত্যুর পথযাত্রী হয়েছেন কিন্তু তাদের ভাগ্যে তা জুটে নি, ফলে তাদের আত্মা এখনও সে না পাওয়ার বেদনায় ভুগছে। কিন্তু আমরা সেই আলোর সন্ধান পেয়েছি। সুতরাং আসুন, রহমান খোদার দরবারে সেই প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সবাই মিলে দু'হাত তুলে স্বর্গীয় স্বজনদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় ক্রন্দন করি।

আমি এক ফেরিওয়ালা বলছি,
তোমরা কেউ পুণ্য কিনবে গো পুণ্য–
কিনলে যা আত্মা হবে ধন্য।

– মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

ইসলামের বিজয় কোন্ পথে?

ইসলাম আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত বিশ্বজনীন শান্তির ধর্ম। ইহা কোন দেশ জাতি কিংবা কোন দলের ধর্ম নহে। বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের ধর্ম। তেমনিভাবে ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসূল করীম (সঃ) রহ্‌মাতুল্লীল আলামীন। তিনি কোন দেশ জাতি কিংবা কোন দলের একচেটিয়া নবী নন। সাদা-কালো উঁচু, নীচু, ধনী-দরিদ্র বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের নবী। তাঁর আগমন হয়েছিল সকল প্রকার মিথ্যা-বি'দাত, অন্যায়-অবিচার, যুলুম-অত্যাচার, মানুষে-মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ ঝগড়া, কলহ-মারামারি, স্বার্থের হানাহানি ইত্যাদির মূল উৎপাটন করে ইসলামের অনাবিল শান্তির ছায়াতলে সকলকে এনে এক মানুষ আরেক মানুষের ভাই হিসাবে পরস্পর প্রীতি-প্রেমের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করতঃ পৃথিবীর বুকে শান্তি-সুখের স্বর্গ রাজ্য গড়ে তুলতে।

ইসলামের বিজয় বলতে কোন রাজ্য জয় অথবা মসনদ লাভের লালসায় ঢাল-তলোয়ার, কামান-বন্দুক, বোমাবাজীতে লিপ্ত হওয়া বুঝায় না। ইসলামের অনুসারী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিকে বুঝায়। এ সম্পর্কে কোন এক নামকরা বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করলাম। তাতে লেখক মহোদয় সারা বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা একশত বিশ কোটি লক্ষ্য করে আনন্দে বুক স্ফীত করে বলেছেন, আমাদের কোন চিন্তার কারণ নেই। এখন শুধু অস্ত্রের প্রয়োজন, তাহলেই আমরা বিজয় লাভ করতে সমর্থ হবো। লেখক বন্ধুবর সম্ভবতঃ ঘুমের ঘোরে অচেতন-অবস্থায় বেহেশতের হুর-পরীর রূপ-লাবণ্যের স্বপ্নে আত্মহারা হয়ে আছেন। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে একটু তাকিয়ে দেখলেন না, এই একশত বিশ কোটি মুসলমানের নেই কোন নেতা, নেই একতা, নেই ভ্রাতৃত্ববোধ। মুসলমান একজন আরেকজনের ভাই এ কথাটি শুধু যে, কেতাবেই লেখা আছে, এ বিষয়ে তিনি চিন্তা ভাবনা করে দেখার অবকাশ পান নি। মুসলমান জাতির পথ প্রদর্শক পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলার কী আদেশ ছিল এবং মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত রসূল করীম (সঃ) কী নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এ সম্পর্কে মনে হয় তিনি গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে আছেন। বর্তমান বিশ্বে পঞ্চাশটিরও উর্ধ্বে মুসলিম রাষ্ট্র। তাদের মধ্যে নেই একতা, নেই কোন নেতা, নেই ভ্রাতৃত্ববোধ, নেই সংহতি। ইসলামের শিক্ষানুসারে মুসলমানগণ যদি একজন নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শকে মেনে চলে, তাহলে পৃথিবীর বুকে এমন কোন শক্তি আছে কি যে, এই জাতির গায়ে আঁচড় দিতে সাহস করে ?

পবিত্র কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "ধর্মে বল প্রয়োগ নেই" (বাকারা)। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "যার হাত এবং জিহ্বা থেকে অন্যেরা নিরাপদ নয়, সে প্রকৃত মু'মিন মুসলমান নয়।" বল প্রয়োগ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ইত্যাদিকে ইসলাম ঘৃণা করে। আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমান জাতিকে যুদ্ধের হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু ইহা আক্রমণাত্মক নয়। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। তাই দেখা যায় যে, প্রাথমিক মুসলমানগণ মিশর সাম্রাজ্য জয় করে আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু শক্তি বল থাকা সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ইথিওপিয়ার উপর কোন প্রকার আক্রমণ করেন নি বা দখলের চেষ্টা করেন নি। কেননা বল প্রয়োগ ইসলামে নিষিদ্ধ। মুসলমানগণ যেখানেই গিয়েছেন, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই ভাই বলে গ্রহণ করে সমান অংশীদার করেছেন।

এখানে আমি 'মৌলবাদ' প্রসংঙ্গে দু'একটি কথা উত্থাপন করতে চাই। বর্তমানে মৌলবাদী তাদেরকেই বলা হয়, যারা ইসলামের মূল শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ধর্মের আবরণে সাধু সেজে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার মহাশক্তিতে সন্দিহান হয়ে ঢাল-তলোয়ার কামান-বন্দুক, বোমাবাজী ইত্যাদির শক্তিকে বড় মনে করে নানান প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টিকরতঃ সমাজ জীবনে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদেরকেই বলা মৌলবাদী। "এবং তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না, তাহারা বলে, আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা করি" (বাকারা)।

পাক কালামে মুসলমান জাতিকে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠতম মন্ডলী, মানবের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ দিবে অসৎ কাজে নিষেধ করবে" (আলে ইমরান)। "তোমরাই বিজয়ী হবে, তোমাদেরই প্রাধান্য রবে যদি তোমরা মু'মিন হও"। প্রশ্ন আসে যে, বর্তমান যুগে প্রাধান্যই বা কাদের, মু'মিনই বা কারা ? ইউরোপ আমেরিকার ইহুদী খ্রীষ্টানগণ অথবা মুসলমানগণ ? মুসলমান জাতিকে আল্লাহ্‌তাআলা উদ্ভব করেছিলেন বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের শিক্ষা-গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে। বর্তমান যমানার শিক্ষা-গুরু কারা ? বড় বড় ডিগ্রী বড় বড় পদের সনদ আনতে দৌড়ানো হয় ইউরোপ আমেরিকার ইহুদী খ্রীষ্টানগণের কাছে। কই, মুসলমান অথবা তার মক্কা মদীনার পাশ দিয়ে-ওতো ঘেঁসে না কেউ ? ইহা কোন্ পাপের ফল ? "আল্লাহ্‌তাআলা একটা জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই জাতি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই করে" (সূরা রা'দ)। শ্রেষ্ঠতম মন্ডলীর চরিত্রও শ্রেষ্ঠতম হওয়া একান্ত প্রয়োজন। চরিত্রহীনতার কারণেই মানুষ অমানবিক কাজে জড়িত হয়ে অন্যায় অবিচার, যুলুম নির্যাতন, খুন-খারাবী ধোঁকাবাজী বোমাবাজী ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত হয়ে সমাজ জীবনে অশান্তি ও বিশৃংখলা ঘটায়। ইসলাম ধর্মে সাফল্য অর্জনের পূর্বশর্ত হলো উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়া। বিশ্বাস ও কর্মে সৎ পথে অবিচল থাকা। সকল প্রকার বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করতঃ চরিত্রবান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা ইসলামের ইবাদত। উপাসনার মূল বিষয়-বস্তুই হলো চরিত্রবান হওয়া। চরিত্রগুণের গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারে না। ইসলামের সাথে এর গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। পৃথিবীর বুকে শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার নামই জীবন নহে। মানুষ যেমন আহার করে নিদ্রা যায় এবং তার কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থের দ্বারা সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন করে থাকে, তদ্রূপ চতুষ্পদ জন্তুও আহার করে নিদ্রা যায় কাম-শক্তিকে চরিতার্থের দ্বারা বাচ্চা পয়দা করে থাকে। এতদসত্ত্বেও মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা কেন ? শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার নামই যদি জীবন হতো তাহলে শৃগাল, কুকুর, শূকর ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা উপাধি পেত নাকি ? পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব এই দু'টির সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। মানুষের কর্তব্য তাঁর পশুসুলভ প্রবৃত্তির সাথে জেহাদ বা সংগ্রাম করে উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়ে মনুষত্বের গুণাবলী অর্জন করতঃ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে সৎপথে অটল থাকা। প্রাথমিক মুসলমানগণ সচ্চরিত্র ও ঈমানের বলে বলিয়ান হয়েই অজ্ঞ স্বল্পসংখ্যক আরবগণ বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তার করতঃ বিজয় পতাকা উড়িয়ে ছিলেন যা আমরা ইতিহাসে পাঠ করে গর্ব অনুভব করে থাকি।

ইসলাম যেমন আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত ধর্ম। তেমনি ইহার রক্ষাকর্তা স্বয়ং তিনিই। ইসলামের অনুসারী মুসলমানগণ কোন্ পথে অবিচল থাকলে বিজয় লাভ করবে তা স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলাই হযরত রসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহ্‌তাআলার রজ্জুকে (খিলাফতকে) সকলে মিলে একত্রে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। (সাবধান) দলে দলে বিছিন্ন হয়ো না" (আলে ইমরান)। আল্লাহ্‌তাআলার রজ্জুটা যে কী তা প্রাথমিক মুসলমানগণ চিনতে পেরেছিলেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই, হযরত রসূল করীম (সঃ) যখন তাঁর এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করতঃ অমর ধামে চলে গেলেন, তখন তাঁর পূত পবিত্র জড় দেহ সমাহিত করা হয় নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাহাবীগণ (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে তাঁদের নেতা হিসেবে খলীফারূপে বরণ করে নিলেন। তাঁদের এই বরণ বাহ্যিক জগতের সংসদ সদস্য বা প্রেসিডেন্ট বরণ করার মতো নয়। এই খলীফা-বরণ কাজে তাঁরা আল্লাহ্‌তাআলার ইচ্ছারই বাহ্য উপলক্ষ্য মাত্র ছিলেন। ইসলামের শিক্ষানুসারে খিলাফতের আধিপত্য একচ্ছত্র। খিলাফতের এই একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নেওয়ার মধ্যেই মুসলমানগণের বিজয় নিহিত। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে তাঁরা এই মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা মু'মিন ও মুসলিম হয়েছিলেন। আজ থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অশিক্ষিত মুষ্টিমেয় আরবদেরকে শিখিয়েছিলেন এই মন্ত্র। এই শিক্ষা দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত বা-জামাত নামাযে ফুটে উঠেছে।

প্রচার শক্তিই ধর্মের প্রাণ। যে ধর্মের প্রচার কার্য নেই সে ধর্ম প্রাণহীন দেহের তুল্য। ইসলাম বিশ্বজনীন প্রচারমূলক ধর্ম। প্রচার ব্যতীত বিশ্বজনীন বার্তা বিশ্ব মানবকে পৌছান যায় না। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আগমন হয়েছিল বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষকে ইসলাম বা শান্তির পতাকা তলে একত্রিত করার জন্য। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর এই গুরু-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল প্রতিটি মুসলমানের উপর বিশেষ করে ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম-ওলামাগণের উপর। ওয়ারেসাতুল আম্বিয়াগণ ইসলাম প্রচারের দুয়ারে তালা লাগিয়ে নির্দিষ্ট মনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেহেশ্‌তে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। বর্তমান বিশ্বে ছয়শত কোটি মানুষ, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা একশত কোটির কিছু উপর। বাকি সবাই অমুসলমান। বর্তমান কালে অমুসলমানগণকে মুসলমান বানায় কে বা কারা ? প্রাথমিক মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র ডাকে ইসলামের প্রয়োজনের নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। যখন যা প্রয়োজন প্রফুল্ল চিত্তে বিলিয়ে দিয়ে তারা জীবনের স্বার্থকতা অনুভব করেছেন। পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনদেরকে বলেছেন, "হে মু'মিনগণ কি হয়েছে তোমাদের, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযান করতে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়; পরবর্তী জীবনের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান জীবন নিয়েই কি তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছ ? এই পৃথিবীর সম্পদ পরকালের তুলনায় যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যদি আমার পথে তোমরা অভিযান না কর তবে তিনি তোমাদেরকে যাতনাপূর্ণ শাস্তি দিবেন। এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন, তোমরা তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন। যদি তোমরা তাঁর সাহায্য না কর তবে শুন, আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য করেছিলেন সেই সময়, যখন কাফিরগণ তাঁকে বের করে দিয়েছিল। যখন তার আর একজন ব্যতিরেকে কোন সঙ্গী ছিল না যখন তিনি এবং তাঁর একটি মাত্র সঙ্গী একটা গহীন আশ্রয় নিয়েছিলেন। যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে অভয় দিয়েছিলেন, কোন ভয় নেই, আল্লাহ্ নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে আছেন, তখন আল্লাহ্ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলেন। এবং এই রকম সেনা দিয়ে তাঁর সাহায্য করেছিলেন, যা তোমরা দেখতে পাও না। এবং অবিশ্বাসী কাফিরদের বাক্যকে নীচু করে দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র বাক্যকেই উচ্চ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ প্রবল বিজ্ঞ" (সূরা তওবা)।

বর্তমান বিশ্বে নামে মাত্র একশ' বিশ কোটি মুসলমান। তাদের নেই কোন নেতা, নেই একতা, নেই ভ্রাতৃত্ববোধ, নেই সংহতি। ইসলামের প্রচার কার্যের দ্বারা অমুসলমানগণকে মুসলমান বানানো দূরে থাকুক, নিজেরাই পথভ্রান্ত। এই অবস্থায় "আমরাই এই যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি আমরাই ইহার রক্ষক" (আল্ হিজর)। আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে আহ্‌মদীয়া জামাত নামে এক সংগঠন স্থাপন করতঃ বহুধা বিচ্ছিন্ন মুসলমানগণকে আল্লাহ্ ও হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর শিখানো ইসলামের বিজয়ের পথে একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানালেন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনে ধর্মযুদ্ধ রহিত হয়ে গেছে। বর্তমান কালে যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি খুনাখুনী ইত্যাদি যা কিছু হচ্ছে সবই মসনদ লাভের আকাঙ্ক্ষায়, ধর্মের জন্য নয়। "যামানার কসম; নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে, সত্যের উপর অটল থাকতে পরস্পরকে উপদেশ প্রদান করে এবং ধৈর্য ধারণ করার জন্য পরস্পরকে উপদেশ দেয়।"

শক্তি প্রয়োগে অস্ত্রবলে কখনও ইসলামের বিজয় সাধিত হবে না। মুসলমানগণ যত শীঘ্র আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করবে তত শীঘ্রই ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত হবে।

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮২৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

কাদিয়ানের প্রতিচ্ছবি – সিদ্দীকিয়তের জামাত

মহান আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন**। অর্থাৎ আমি জিন্ন ও ইনসানকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ্‌ পাক তাঁর ইবাদতকে এই ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে এক লাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন। তাঁদের শিরোমণি ও জগতের সবার জন্য রহমত খোদার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ)-কে পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা শরীয়তের প্রেরণের দিক থেকে এই সিলসিলার শেষ করেন। এই নবীদের প্রতিচ্ছবিরূপে যারা স্বীয় প্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হয় আর নবীর সাথে জনমে মরণে একত্রীকরণের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয় যাদের মধ্যে সেই জ্যোতিঃ থাকে যদ্বারা কোনরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই যুগের মহাপুরুষকে তারা চিনতে পারে তাদেরকেই খোদাতাআলা 'সিদ্দীক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর তাদের উপমা এবং তাদের আদর্শ এমন হয় যে, তদ্দর্শনে সমসাময়িক লোকেরাও যুগ-ইমামের পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এক কথায় সিদ্দীকগণ এমন হন যেন তারা একটি আয়না, যার মধ্যে খোদার তাজাল্লীয়তের ছাপ পড়ে। আর তা গিয়ে সরাসরি ক্রিয়া করে (তাদের সাথে তো বটেই) তাদের সমাজে অবস্থিত মুক্তপ্রাণ ও খোলা হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের উপর। বাংলাদেশে আহমদীয়ত এসেছে একেবারে প্রাথমিক কালেই। আর প্রাথমিককালের আহমদীয়তের বিস্তৃতি প্রাপ্তির দিক থেকে এদেশে প্রথম সারির জামাতগুলোর মধ্যে ছিল তারুয়া জামাত। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় জামাত প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই পার্শ্ববর্তী তারুয়া , সরাইল ও ক্রোড়ায় এই প্রভাব পড়ে ও জামাতী কার্যক্রম শুরু হয়। আমি কোন ঐতিহাসিক নই। যদি বলি আমি ইতিহাস লিখতে বসেছি তবে তা হবে নিতান্তই ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শামিল। তবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াকে নিয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন কথোপকথন ও মুরব্বীদের বর্ণিত কথা থেকেই কিছু লিখব বলে ভাবছিলাম। তবে এই লেখার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। এটি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশে সহায়ক লেখা। আর তথ্যগত কোন ভুল থাকলে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

শরীয়তপুরের ছেলে হলেও আহমদীয়ত আমায় টেনে এনেছে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া আজ আমার গর্ব, আমার অহংকার। জামাতী পরিবেশে বেড়ে উঠা হয়েছে আমার এই ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেই। সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া, ঘাটুরা, ক্রোড়া ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, শালগাঁও প্রভৃতি জায়গার মাটির সাথে রয়েছে আমার নাড়ীর সে বন্ধন যা কোনদিন ছিঁড়ে যাবে না। সে বাঁধন আত্মার - সে গঠন আহমদীয়তের। আমার এখনো মনে পড়ে একেবারে ছোটকালে আম্মার সাথে (আমাতুল হাবিবা) তারুয়া জলসাতে যেতে গিয়ে রাতে বিছানায় প্রশ্রাব করা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদে মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্‌ সাহেবের রুমি টুপির কালো সুতাগুলো সবই আমায় আজো আন্দোলিত করে। হাফিজ ভাই সাইকেলের পিছনে বসিয়ে প্রতি জুমুআয় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদে নিয়ে যেত। আম্মার কথামতো তাঁর এতে কোন ব্যত্যয় হতো না। বিভিন্ন দোকানে গিয়ে পুতুলের কাপড় দিত। সবই আমার জন্য আজ সোনালী অতীত যে অতীতে আমি বেড়ে উঠেছি এক আহমদী হিসাবে আমার মায়ের কোলে পরম আগ্রহে আতিশয্যে।

আমার বড় হওয়ার পর কোনদিন তারুয়া জলসাতে যাওয়া হয় নি। এবারকার ৫৮তম সালানা জলসায় কণ্ঠ শিল্পী (নযম) ইব্রায়েত ভাইয়ের আমন্ত্রণে আর আন্তরিক সম্পর্কের আবহে একদিনে ঠিক করলাম এবারের ৩য় সহস্রাব্দের প্রথম জলসায় যাবো। মাসুমের বাড়ি তারুয়াতে। তাই প্রথমে তাকে বললাম আমাকে নিয়ে যাবে কিনা। সে বলল ১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতের তূর্ণা নিশীথে করে যাবে। আমি রাজি হ'লাম। তবে সে তার কিছু ব্যক্তিগত অসুবিধার কথাও বলে। তাই চিন্তা করলাম মাসুমের সাথে গিয়ে তার কর্মসূচী বানচাল করবো না। পরদিন সকালের ট্রেনে করে আমি, রেজাউল করীম সাহেব, ফয়েজুল্লা চাচা, হামিদুর রহমান সাহেব, পাভেল ভাই, তারুয়া জলসার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ষ্টেশনে পৌছে দেখি লোকজন দাঁড়ানো। বাঁধন মামা, সরাইলের নবদীক্ষিত আহমদ ক্বারী বশির ভাই, মলাই মামা, শিহাব ভাই, খোকন ভাই সহ আরো অনেকেই আমাদের স্বাগত জানালো। নেমেই প্রথম ২৫ তারিখের টিকিট নিলাম। আমীর সাহেব আমাদের জন্য পূর্বেই গাড়ি পাঠিয়েছিলেন সেই গাড়িতে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ষ্টেশন থেকে আমরা তারুয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। কয়েকজন লোক ট্যাম্পু যোগেও রওয়ানা দেয়। তারুয়া যাবার পথে বিশ্ব রোডে গিয়ে গাড়ি অকটন নেয়। গাড়িতে বিভিন্ন জামাতী ঈমানোদ্দীপক কথা-বার্তা চলতে থাকে। এক সময় আমরা পৌঁছে গেলাম তারুয়াতে। তারুয়াতে অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবার গ্রামীণ ব্যাংকের রেষ্ট হাউজে। সেখানে গিয়ে MTA কর্মী টোটন ভাই ও অপুকে পেলাম। মৌলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর তসাদ্দক হোসেন সাহেব ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব সেখানে পূর্বেই পৌছে গিয়েছিলেন। সবার সাথে দেখা হলো, মোলাকাত হলো। ইব্রায়েত ভাই উনার স্বভাবসুলভ ভারী হাসিতে সবাইকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা কাপড় ছেড়ে ওযূ করে খাওয়া-দাওয়া করলাম। গেষ্ট হাউজের খাদেমগণও যথেষ্ট উৎসাহী ও কর্মতৎপর। খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ করে চলে যাই জলসাগাহে। জুমুআর নামায পড়ালেন মৌলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব। তিনি তাঁর খুতবায় বিশেষভাবে তারুয়া বাসীকে বললেন যে, এই জামাত সিদ্দীকদের জামাত। আর প্রথম যুগের আহমদীদের মধ্যে ছিলেন– যাঁদের দ্বারা এই জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে – মরহুম আহমদুল্লাহ্‌, মরহুম আওসাফ আলী মুন্সী, মরহুম মঈনুদ্দীন মুন্সী, মরহুম মুন্সী ওয়াহিদুল্লাহ্‌, মরহুম মুন্সী দিয়ানুদ্দীন মাষ্টার, মরহুম আব্দুর রাজ্জাক মুন্সী, মরহুম মুন্সী সাবুদ আলী , মরহুম মস্তু মিয়া , মরহুম হানিফ কোরাইশী, মরহুম মৌলভী শামসুয্‌যামান, মোয়াল্লেম, মরহুম মুহাম্মদ রফিক , মরহুম মুন্সী আবদুল লতিফ, মরহুম মুন্সী সামদার আলী, মরহুম সহীদ আব্দুর

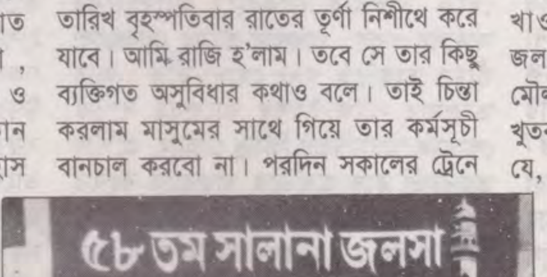

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া'র ৫৮তম সালানা জলসা-২০০১

রহিম , মুন্সী আকসার উদ্দিন, মুন্সী আলী আকবর সহ আরো অনেকেই যাঁদের উন্নত চরিত্র ও মানসিকতা আর আমল দেখেই লোকজন বয়াত করতো। আজ আমাদের ময়দানে আমাদেরকেও এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। হুযূর (আইঃ)-এর তাহরীক মতো শতকরা একশ' ভাগ নামাযী হয়ে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করলেই তাদের আত্মা শান্তি পাবে আর তাঁদের ত্যাগও নতুন করে আনন্দিত ও আন্দোলিত হবে। দোয়া এবং তাঁদের পবিত্র পদাংক অনুসরণের জন্য নামোল্লেখ করা হ'ল। তারুয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালে। ১৯১২ সালে মরহুম আহমদ উল্লাহ সাহেব প্রথম বয়াত করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। নামাযের পর যথারীতি তেলাওয়াতে কুরআনের পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধন করেন। অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল পরিবেশে সবার অক্লান্ত পরিশ্রম ও খোদার অপার দায় সাফল্যজনকভাবে তারুয়ার জলসার সমাপ্তি ঘটে। শেষের দিন বিরোধিতার ধোঁয়া উঠলেও তা আর আলোর মুখ দেখে নি। মু'মিনগণের সম্মিলিত দোয়ায় স্রোতে তার সবগুলোই ব্যর্থ হয়ে গেছে। সব চেয়ে ভাল লাগছিল -শেষদিন ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপনী বক্তৃতা হচ্ছিল। এক সময় পার্শ্ববর্তী অ-আহমদী মসজিদ থেকে আসরের সময় ঘোষণা করল "আহমদী ভাইয়েরা,সোয়া চারটায় আমাদের জামাত (তখন সোয়া চারটা বাজছিল) আপনারা দশ মিনিট রেয়াত দিন। সাথে সাথে ন্যাশনাল আমীর সাহেব মাইকে শুধু বললেন, 'জাযাকাল্লাহ্' । দশ মিনিট পরে আবার কার্যক্রম শুরু হয়। পরে জানা গিয়েছিল এই ঘোষনা এলাকায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। আহমদী ও অ-আহমদীর এমন প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান সত্যই মনোমুগ্ধকর। রাতের তবলিগী সভাগুলো হতো আরো চমৎকার। যুক্তির শাণিত তরবারীতে মিথ্যার জালকে ছিন্ন করার ক্ষমতা একমাত্র সুলতানুল কলমের অনুসারীদের হাতেই দেয়া হয়েছে।

কাদিয়ান জলসার সাথে এই জলসার মিলের দিকটি আমি এখন বলতে যাচ্ছি।এবারই প্রথম স্থানীয় জামাতের সবাই জলসার খাবার খেয়েছে। বিভিন্ন জামাত থেকে আগত মেহমানদেরকে নিজেদের ঘরে জায়গা করে দিয়েছে তারুয়ার লোকজন। এমনো ঘটনা ঘটেছে যে, নিজের ঘরে মেহমানদেরকে থাকতে দিয়ে গৃহের মালিক বাইরে হাঁটছেন। এই দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। মাসুমের সাথে ঢাকায় কথাচ্ছলে একদিন বলেছিলাম, তোমার বাড়ি যদিও তারুয়াতে। তবুও তোমার চেয়ে আমার আত্মীয় অনেক বেশি তারুয়াতে। এই কথা প্রমাণ হতে লাগলো নিজে নিজেই। মসজিদের পার্শ্বে মাসুমদের বাড়িতে মাসুমকে খুঁজতে গিয়ে দেখি পুষ্প আপার বাড়ীও এখানে। পুষ্প আপার বড় মেয়ে বলতে লাগলো, তুমি ছোট বেলায় তোমার আম্মার সাথে এখানে এসেছেন। পুষ্প আপা পিঠা, পায়েস, সেমাই আরো কতো কি খাওয়ালো। মাসুমকে বললাম, দেখ তোমার ঘরেই আমার আত্মীয়। যাক রাতে থাকার জায়গা নেই। আমি আর মাসুম হাঁটতে হাঁটতে বাজারে গেলাম। সেখানে একটি দোকানে গিয়ে দেখি দোকান মালিক (চায়ের দোকান) চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের অবস্থা বললাম। আমরা রাতে থাকতে চাইলাম। সে আনন্দে রাজি হলো। চুলা ধরিয়ে চা খাওয়ালো। T.V. বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। কর্মচারীকে বলে গেল, আমাদের খেয়াল রাখতে। টুল জোড়া দিয়ে আমি আর মাসুম প্রায় জেগেই শুয়ে বসে বিভিন্ন আলাপচারিতার মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করি। ভোরে ফজরের নামায আদায় করে তারপর গেষ্টরুমে অন্যদের সিটে ঘুমাই। ঘুম চলে ১০-৩০ পর্যন্ত। আমি দুধ খেতে পসন্দ করি না। কিন্তু তারুয়ায় খাবার পরে দুধ খেয়ে এত মজা পেয়েছিলাম যে, আমি রীতিমতো দুধ পাগল। এই যে সহযোগিতা-বাজারে,দোকানে বলে বুঝানো মুস্কিল। এখন আমি গ্রামে সর্বত্র জলসায় মু'মিন হিসাবে আপ্যায়ন বা সম্মান দান-এদিক থেকে তারুয়ায় একেবারে কাদিয়ানের আর্দশের ধারক। তারুয়ায় গ্রামের লোকগুলো ভীষণ আন্তরিক এবং খোদা-ভীরু। আর তারুয়ার সাথে শৈশব কালেরই সম্পর্ক খোদ্দমুল আহমদীয়ার বিভিন্ন প্রোগ্রাম, তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস প্রভৃতিতে তারুয়াতে বহুবার এসেছি। আর জলসায় এসে উপলব্ধিটা আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। ইব্রায়েত ভাইকে মজা করে বলেছিলাম ৫৭ বার ডেকেও কেউ আমায় এখানে আনতে পারে নি। আপনার ৫৮তম ডাকটি উপেক্ষা করতে পারি নি। তবে দুঃখের ব্যাপার হলো তারুয়াতে এখনো এমারত কায়েম হয় নি। নায়েব ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, এই ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার লোকদের মাধ্যমেই সরিষাবাড়ীতে (তাঁর নিজের বাড়ি) আহমদীয়ত প্রচার হয়েছে। এখন আপনারা সিদ্ধান্ত নিন সরিষাবাড়ীতে আগে এমারত প্রতিষ্ঠিত হবে নাকি তারুয়াতে। তারুয়ার যে জোয়ার আমি দেখেছি তাতে আমি নিশ্চিত, অতি শীঘ্রই এখানে এমারত প্রতিষ্ঠিত হবে। তারুয়া সেই ভূমি যেখানে পদধূলি পড়েছে আমাদের বর্তমান হুযূর (আইঃ)-এর। এছাড়াও বিশিষ্ট বুযূর্গদের পদধূলিতে ও দোয়াতে তারুয়ার ভূমি ভিন্ন দ্যেতনা লাভ করেছে। প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবও তারুয়ার সন্তান। তারুয়ার কোরাইশী সাহেব যিনি মূলতঃ কাশ্মিরী (মাসুমের পূর্ব-পুরুষ) তিনি সাইকেল চালিয়ে তাতে আহমদীয়তের প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে কাশ্মির থেকে এতদঞ্চলে চলে এসেছিলেন। আমার নানুর (সৈয়দা আমাতুর রহমান) দরজায় তাঁর লেখা আরবী এখনো বিদ্যমান। তিনি খুব সুন্দর করে লিখতে জানতেন। লতিফ মুন্সী সাহেবের দুই ছেলের সাথেই আমার দুই খালার বিয়ে হয়। খালুদের মধ্যে আব্দুল আলীম সাহেব মারা গেছেন। আর আব্দুল ওহাব সাহেব এখনো রয়েছেন। জলসার মাঝে মাঝে ইব্রায়েত ভাইয়ের নযমের সুরে শ্রোতামন্ডলী উদ্বেলিত হয়ে উঠত। তাঁর বাংলা নযমের সুর সত্যই সুন্দর। জলসার পর সরাইল চলে যাই যখন দোয়ার মাধ্যমে জলসা শেষ হচ্ছিল তখন বার বারই মনে পড়ছিল মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সেই দোয়া "যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করেন, খোদা তাদের সহায় হউন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের উপর দয়া পরবশ হউন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দুঃখ -কষ্ট হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিনে তাদেরকে খোদা তাঁর সেই সকল বান্দাদের সঙ্গে উপস্থিত করুন যাদের উপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হউন। হে খোদা হে মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এই সবগুলি দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই, আমীন, সুম্মা আমীন" (বিজ্ঞাপনঃ ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ইং)।

– মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব(জয়)

কেন্দ্রীয় সালানা জলসার ইতিবৃত্ত

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যখন মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী হওয়ার দাবী করেন এবং তাঁর অনুসারীদের নিকট থেকে বয়াত নেওয়া শুরু করেন, তখন ভারতের একদল মৌলবী চরমভাবে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। বিরোধিতার মোকাবেলার জন্য তিনি তিনি ব্যাপক গণসংযোগ শুরু করেন। এ সব কাজে তাঁকে কষ্ট করে বহুদূরে গিয়ে জনগণকে সঠিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে হ'ত। এ সময় তাঁর মনে নও মোবায়েঈনদের তা'লীম ও তরবিয়ত সম্পর্কে চিন্তা আসে। তিনি খোদার কাছে এজন্য দোয়া করতে থাকেন। ১৮৯১ সালে আল্লাহ্র আদেশে কাদিয়ানে ২৭, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর তিনি প্রথম সালানা জলসার দিন ধার্য করেন। এই জলসা নির্ধারিত সময়ে মসজিদে আকসাতে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭৫ জন মেহমান এতে যোগদান করেন। ব্যাপক মোখালেফাতের কারণে অনেকে ঘর-বাড়ী ছেড়ে জলসাতে আসতে পারেন নি। এ বছর জলসাতে বয়াত গ্রহণ করেন হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) হযরত মীর নাসের নওয়াব (রাঃ)। হযরত মৌলবী গোলাম নবী খোশাবী (রাঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ।

প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৯২ সালে ৩২৭ জন মেহমান সালানা জলসাতে যোগদান করেন। এবছর জলসাতে যে সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব বয়াত গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন- হযরত ডাঃ খলীফা রশিদ উদ্দীন সাহেব (রাঃ), হযরত পীর মুনজুর মুহাম্মদ সাহেব (রাঃ), হযরত মাওলানা রোহান উদ্দিন সাহেব ঝিলামী ও হযরত হাফেয মোক্তার আহমদ সাহেব সাহজানপুরী।

এ সময় মজলিসে শূরার ব্যবস্থা ছিল না। জলসার অধিবেশনের অবসরে জামাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ে প্রথম দু'বছর সালানা জলসার পর বিভিন্ন কারণে তৃতীয় বছর জলসা বন্ধ থাকে। এরপর থেকে হুযূর আকদসের (আঃ) মৃত্যু পর্যন্ত এবং খলীফা আউয়াল (রাঃ)-এর প্রথম পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯১২ সালে পর্যন্ত এ জলসা ধারাবাহিকভাবে মসজিদে আকসাতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মসজিদে নূরে এবং ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মসজিদে নূরের বাইরে তা'লীমুল ইসলাম কলেজ (বর্তমান খালসা কলেজ) মাঠে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সালে কাদিয়ান ও রাবওয়াতে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত রাবওয়াতে সালানা জলসা ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর হিজরতের পর লন্ডনে এবং পরে টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে শান ও শওকতের সাথে এ জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং দিন দিন মেহমানের সংখ্যা ও বৈচিত্র বাড়ছে।

১৮৯১ সালে প্রথম জলসায় ৭৫ জন যোগদান করে ১৯০৭ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) শেষ জলসায় মেহেমান ছিলেন দু'হাজারের মত। হযরত খলীফা আউয়ালের (রাঃ) মৃত্যুর বছরে অর্থাৎ ১৯১৩ সালে মেহেমানের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের বেশী। ১৯৬৪ সালে হযরত খলীফা সানীর (রাঃ) শেষ বছরে জলসায় মেহেমানের সংখ্যা ছিল এক লাখেরও বেশী। হযরত খলীফা সালেস (রাহেঃ)-এর মৃত্যুর বছরে ১৯৮১ সনে জলসায় মেহেমানের সংখ্যা ছিল দু'লাখের বেশী এবং হযরত খলীফা রাবে' (আইঃ)-এর হিজরতের পূর্বের বছরে মেহেমানের উপস্থিতি ছিল আড়াই লাখেরও বেশী।

জলসাতে পুরুষদের যোগদানের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে মহিলারাও বেশী বেশী আসতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) মহিলাদের জন্য প্রথম স্থানে জলসার ব্যবস্থা করেন। এরপর থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্গণ এতে বক্তব্য রাখতে থাকেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ এর ব্যবস্থাপনায় জলসা সম্পন্ন হয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সময়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অনেক দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব দেশ থেকে আহমদীগণ রাবওয়ার সালানা জলসাতে যোগদান করতেন। ফলে এ জলসা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। এছাড়া বিভিন্ন দেশে এমনকি অনেক দেশের অঙ্গরাজ্যেও সালানা জলসা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এ সব জলসাতে তা'লীম, তরবিয়ত এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাবওয়ার কেন্দ্রীয় সালানা জলসার অনুসরণ এবং হুযূরের (আইঃ) বাণী পাঠ করা হ'ত। এমটি-এর প্রচলনের ফলে জলসা সালানাগুলির রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন জলসাতে হুযূর (আইঃ) এমটি-এর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য রাখতে শুরু করেন এবং সারা বিশ্বের আহমদীরা এই জলসাগুলি অবলোকনের সুযোগ পান।

১৯৯৩ সালের ১লা আগস্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। আল্লাহ্র খাস ফযল ও অনুগ্রহে হযরত মুহাম্মদ (সঃ), মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও খলীফাদের দোয়ার বরকতে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এমটিএ-র মত একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর হাতে ছিল। যার মাধ্যমে এ দিনেই তিনি আন্তর্জাতিক বয়াত শুরু করেন। এ বয়াতের সময় পাঁচ মহাদেশের পাঁচজন প্রতিনিধি হুযূর (আইঃ)-এর পবিত্র হাত ধরে বয়াত করেন। উপস্থিত মেহেমানগণ সারিতে এসে একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে এবং জলসা প্যান্ডেলে উপস্থিত অন্যান্য সকলে অনুরূপভাবে বয়াত করেন যাতে হুযূরের সাথে শারীরিক সংযোগ রক্ষা হয়। সাথে সাথে এমটিএ-র মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকেরাও বয়াত করতে থাকেন। হুযূর (আইঃ) বয়াত ইংরেজীতে পড়ান এবং অন্যান্যরা নিজ নিজ মাতৃভাষাতে এ বয়াত পড়েন। জলসা সালানার তৃতীয় দিনে এই বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এখন পর্যন্ত আটটি আন্তর্জাতিক বয়াত হয়েছে। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক বয়াত হয় ২০০০ সনে। ৪ কোটি ১৩ লাখ ৮ হাজার ৩শ' ৭৫জন লোক ২০০টি ভাষায় আন্তর্জাতিক বয়াতে অংশগ্রহণ করে।

জলসায় দোয়া আন্তর্জাতিক ইজতেমায়ী দোয়াতে পরিণত হয়। উপগ্রহের দ্বারা পৃথিবীর সকল দেশে এমটিএ-র চ্যানেল থাকাতে এর মাধ্যমে হুযূর (আইঃ)-এর সাথে দুনিয়ার সকল আহমদী দোয়াতে শরীক হন। হুযূর (আইঃ) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্ "আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উন্নতি দাও, দুনিয়াতে শান্তি কায়েম কর, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্ম যেন ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। তিনি আরও দোয়া করেন হে খোদা, পৃথিবীর সকলকে বিপদ ও মারাত্মক ব্যাধি ও আসমানী আযাব থেকে বাঁচাও এবং তোমার আশিস নাযেল কর, 'আমীন'।

– মোঃ কওসার আলী মোল্লা

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

-হযরত মির্যা তাহের আহমদ

ঔষধ নম্বর-৬

এড্রেনালিন
ADRENALIN
(Epinephrin)

এড্রেনালিন হ'লো কিডনীর উপরোস্থ গ্রন্থি **(Suprarenal Glands)** থেকে নিঃসরিত একপ্রকার রস যা অনেকগুলো গ্রন্থির কাজের ভারসাম্য রক্ষা করে। হোমিওপ্যাথিতে একে ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। ক্রোধ, ভয় আর আতঙ্কের ফলশ্রুতিতে যেসব মন্দ প্রভাব দেহে বিস্তার লাভ করে সবই এর রোগীর মাঝে বিদ্যমান থাকে। হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে যায়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, দমবন্ধ হবার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, পাকস্থলীর কার্যক্রমের গতি শ্লথ হয় আর মুখ গহ্বর শুষ্ক হয়ে থাকে। এর মিশ্রণে রক্তনালীর আশে পাশের পেশীসমূকে সঙ্কুচিত করার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই ঔষধটি **সব ধরনের রক্তক্ষরণ রোধে** সাহায্য করে থাকে। ফুসফুস, নাক, পাকস্থলীর নীম্নস্থ অন্ত্রে, গর্ভাশয় কিংবা অন্য কোন স্থলে থেকে রক্তক্ষরণকালে যদি কোন ঔষধের নির্দিষ্ট লক্ষণ পাওয়া না যায় তাহলে **এড্রেনালিন**-কে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে নাক থেকে রক্তক্ষরণে এটি অতীব উপকারী। অনেক শৈল্যচিকিৎসক অপারেশনের পূর্বে একে ব্যবহার করে থাকেন যাতে রক্তের অপচয় না হয়।

এক চিকিৎসকের মতে, **'এনজাইনা'** (হৃদরোগ) আর এর সদৃশ লক্ষণাদিতেও এড্রেনালিন উপকারী। হৃৎপিন্ডের কাছাকাছি আর খাদ্যাহারের পরে কিংবা হাঁটা-চলার কারণে বুকের হাড়ের কাছে যে ব্যথা আরম্ভ হয় উক্ত চিকিৎসকের মতে এসব ক্ষেত্রে এই ঔষধটি উপকারী। **বুকের চাপ আর অস্বস্তিতেও** এটা কার্যকরী যেহেতু রক্তনালী সঙ্কুচিত হবার কারণে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাই এর হোমিও পোটেন্সী রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও কার্যকর হতে পারে। এ বিষয়ে যেহেতু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই তাই আমি এ ক্ষেত্রে কেবল অন্যান্য চিকিৎসকদের মতামত তুলে ধরছি। অতি সাবধানতার সাথে রোগীকে বিশ্লেষণ করে এড্রেনালিনের কার্যকারিতাকে বুঝা দরকার।

আমি অবশ্য কয়েকটি রোগের ক্ষেত্রে এড্রেনালিন অতীব কার্যকারী সাব্যস্ত হতে দেখেছি। প্রস্রাবের সাথে যদি রক্ত নির্গত হয় তাহলে এই ঔষধ উপকার সাধন করে। এক্ষেত্রে প্রস্রাব পরিমাণে বেশী হয় আর বার বার হয়ে থাকে আবার প্রস্রাবের পূর্বে ও পরে জ্বলন হয়। নেট্রম মিউরেও এই একই লক্ষণ বিদ্যমান।

পায়ের আঙ্গুলে যদি 'কড়া' পড়ে যায় যাকে ইংরেজীতে (Corn) বলে এক্ষেত্রেও এই ঔষধটি উপকারী। এ ধরনের রোগীর পা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকে (Calf musles) -এর ব্যথা আর খিচুনীর মত লক্ষণ থাকে।

সেবা পটেন্সী : ৩০ থেকে ২০০

ঔষধ নম্বর-৭

এসকুলাস হিপোকাসটেনম
AESCULUS HIPPOCAS-TANUM
(Horse Chestnut)

এসকুলাসের সবচাইতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলাভাব। ক্লান্তি আর দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট মস্তিষ্কের অস্থিরতা একটি স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু এসকুলাস এমন একটি ঔষধ যার রোগী ঘুমিয়ে উঠলে আরও বেশী মানসিক অস্থিরতার শিকার হয়ে যায়। রোগী ঘুম থেকে উঠলে তার মস্তিষ্কে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে– সে কোথায় আছে, তার আশে-পাশে কী আছে, আর কারা আছে কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না। কোন নতুন স্থানে গিয়ে সেখানে রাত কাটিয়ে উঠলে কখনো কখনো সুস্থ-সবল মানুষের মস্তিষ্কও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু এধরনের অবস্থা অস্থায়ী হয়ে থাকে যা সফরের (ভ্রমণের) কারণে হয়ে যায়, তার স্মৃতিশক্তি যদি হ্রাস পেতে থাকে, তার মেজাযে যদি দুঃখ বা ক্রোধ বিস্তার লাভ করে, কাজের প্রতি যদি অনীহা জন্মায় তাহলে এসকুলাস-ই তার ঔষধ।

এসকুলাসের লক্ষণ সম্বলিত শিশুদের মাঝেও স্মৃতিশক্তির হ্রাস দেখা যায়, তারা **রাগী মেজাযের** হয়ে থাকে, ঘুম থেকে **ভয় পেয়ে জাগ্রত হয়**, বড়ই **স্পর্শকাতর** আর **বিদ্বেষী** স্বভাবের অধিকারী হয়ে যায়। এ ধরনের শিশুদের যদি শাসন করা হয় তাহলে এই দুঃখের আঘাতে কখনো কখনো তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আবার কখনো কখনো এই **অজ্ঞানতা মৃগীর রূপ ধারণ করে**। এসকুলাস-কে কেবল শিশুদের ঔষধ বলে মনে করা ঠিক নয় বরং এই ঔষুধটি সব বয়সের রোগীর জন্য কার্যকর।

রক্তাভ লাল চোখ এসকুলাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। চোখের যে সব শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্ত সঞ্চালিত হয় সেগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে আর সামান্য চাপে চোখ লাল হয়ে যায়। কিছু কিছু হোমিও চিকিৎসক এই রক্তাভ চক্ষু রোগকে চোখের অর্শ্ব বলে উল্লেখ করেন। চোখ ভারী ভারী মনে হয়, চোখ থেকে পানি পড়ে, চোখের পাতা আর বা চোখের নীচের পেশীতে স্পন্দন দেখা দেয়, চোখের মণিতে ব্যথা হয়।

এসকুলাসের রোগী সাধারণতঃ শীত বোধ করে। ব্যথার স্থলে গরম সেঁক দিলে রোগী স্বস্তি অনুভব করে। পালসেটিলার মত ব্যথা সমস্ত শরীরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই দুই ঔষধের মাঝে একটি তফাৎ আছে। পালসেটিলার ব্যথা

সর্বদা গরম সেঁকে বৃদ্ধি পায় আর ঠান্ডায় উপশম হয়। পালসেটিলায় বিষাদপূর্ণ মানসিক অবস্থা আর স্বভাবের নম্রতা পাওয়া যায়। এসকুলাসে যদিও বিষাদপূর্ণ মানসিক অবস্থা বিদ্যমান কিন্তু স্বভাবে নম্রতা পাওয়া যায় না আর এর ব্যথা গরম সেঁকে উপশম হয়।

এসকুলাসের রোগীর কোমরে সবসময় ক্লান্তিকর ব্যথার একটি অনুভূতি থাকে। মেরুদন্ডে দুর্বলতা দেখা দেয়। কোমর আর পা যেন কাজ করতে চায় না। হাঁটতে গেলে পা কাঁপে, বসা থেকে ওঠা বড়ই কষ্টসাধ্য হয়। ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যথা হয়, ঘাড়ের পেছন দিকে ক্লান্তিকর অনুভূতি, ডান কাঁধে আর বুকে ব্যথা থাকে যা শ্বাস নিতে বৃদ্ধি পায়, হাত ও পায়ে প্রদাহ থাকে, হাত ধৌত করলে হাত লাল হয়ে যায়, গিরায় গিরায় খিচুনী আর ব্যথার অনুভূতি আর এগুলো আবার স্থানান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক ঝটকা খাওয়ার ন্যায় তীব্র ব্যথা, সেঁক প্রয়োগে ব্যথা উপশম। এসব লক্ষণাদি এসকুলাসের কার্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এসকুলাস-এ বিশেষ এক ধরনের অর্শ দেখা যায়। আঙুরের গুচ্ছের মত নীলচে রঙের দু' চারটা আঁচিল একত্রে দেখা যায় এগুলোতে তীব্র জ্বলন অনুভূত হয়। দাঁড়ালে আর হাঁটলে ব্যথার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বসলেও জ্বলন, শুষ্কতা আর মনে হয় যেন স্থানটি (?) ভরে আছে। মল কঠিন আর কষ্টকর হয়। মলত্যাগের পর মলদ্বারে সাংঘাতিক ব্যথা করে।

এসকুলাসে কিডনীর প্রচন্ড ব্যথাও উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে বাম কিডনীর ব্যথা। বার বার প্রসাবের বেগ হয় কিন্তু পরিমাণে হয় অল্প। কালো রঙের তীব্র জ্বালাময় প্রস্রাব নির্গত হয়।

মহিলাদের মাসিক চলাকালে প্রচন্ড কোমর ব্যথা, দুর্বলতা আর গর্ভাশয়ের ভেতর দিকে পতন এসকুলাসের নির্দিষ্ট লক্ষণ। নিউকোরিয়া গাঢ় হলুদ বর্ণের আর ঘন হয়ে থাকে।

এসকুলাস-এ হৃদপিন্ডের ব্যাধিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হৃদপিন্ডের স্থানে জ্বলন আর ব্যথা, হৃদস্পন্দন দ্রুততর হবার কারণে শিরায় শিরায় স্পন্দন ধরা পড়ে। বুকে গরম বোধ হয়।

এসকুলাস-এ খাদ্যাহারের পর অনবরত অস্থিরতা বোধ হয়, পেট জ্বলে আর মনে হয় যেন এখনই বমি হয়ে যাবে। গোটা পরিপাকতন্ত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়। পাকস্থলীতে পাথরের মত বোঝা অনুভূত হয়। ভুক্ত খাবার টক স্বাদে রূপান্তরিত হয় আর অম্লস্বাদযুক্ত ঢেঁকুর উঠতে থাকে। মুখে সারাক্ষণ ধাতব স্বাদ থাকে, লালা ঘন, জিহ্বার উপর সাদা কিংবা হলুদ রঙের মোটা আস্তরণ আর মুখে বেশী পরিমাণ থু থু আসা এসকুলাসের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। গলায় উত্তাপ বোধ, শুষ্কতা আর প্রদাহের অনুভূতি, ঢোক গিললে এমন ব্যথা হয় যা কানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসকুলাসে ঠান্ডায়, হাঁটা-চলা করলে, খাদ্যাহারের পর আর ঘুম থেকে জাগার পর কষ্ট বৃদ্ধি পায়।

এসকুলাস Varicose Veins (রগের গিঁঠ বাধা) রোগের অর্থাৎ রগের গিঁঠ বেধে ফুলে যাবার উৎকৃষ্ট ঔষধ। গর্ভকালে সাধারণতঃ মহিলাদের পায়ে জালের মত অনেক রগ ফুলে ওঠে, চারিদিকে নীল রঙের শিরা-উপশিরা ছড়ানো দেখা যায়। এটা বড়ই কষ্টকর একটি ব্যাধি। এই রোগে এসকুলাস অতীব উপকারী

প্রভাব বিনষ্টকারী ঃ নাক্স ভমিকা

সেব্য পটেন্সী ঃ ৩০ থেকে ২০০

সাব্যস্ত হয়েছে। (চলবে)

সীরাতুন্নবী জলসা

গত ১৫ই ডিসেম্বর বাদ মাগরিব ৬টা হইতে ৮টা পর্যন্ত খাকসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহানবী (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তাগণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। লেকচার লুধিয়ানা পুস্তকের উপরও আরেকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জামাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডকে যাতে আল্লাহ কবুল ও বাবরকত করেন সেজন্য দোয়ার বিনীত আবেদন করছি।

- **ডাঃ রুহুল আমীন**, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইসলামগঞ্জ

❑ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার বাসুদের হালকার খোদ্দামদের উদ্যোগে গত ১৩/১/২০০১ইং রোজ শনিবার মাস্টার খলিলুর রহমান সাহেবের বাড়ীতে জাঁকজমকপূর্ণভাবে সিরাতুন্নবী জলসা উদযাপিত হয়। এতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১১২ জন।

রুমেল আহমদ, মোতামাদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া

শুভ বিবাহ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কান্দিপাড়া নিবাসী জনাব ফারুক আহমদ ভুইয়া ও মিসেস মাকসুদা বেগমের কন্যা এবং মরহুম নূরুল ইসলাম চক্রবর্তী সাহেবের নাত্নী ফাতেমা মনোয়ার মনি'র শুভ বিবাহ ২৭২/৩ মালিবাগ, ঢাকা নিবাসী জনাব আমীর খসরু ও মিসেস সামীয়া আখতার এর প্রথম পুত্র মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মিঠু'র সাথে ১,২৫,০০১/- (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০০১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের আমীর সাহেব, নায়েবে আমীর সাহেব ও আমেলার সদস্যবৃন্দসহ বহু আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর উপস্থিতিতে বিবাহের এলান করেন মৌলবী মজিদুল ইসলাম সাহেব, মোয়াল্লেম এবং দোয়া পরিচালনা করেন আমীর জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ সাহেব।

এই বিবাহ যেন সকল দিক থেকে বা-বরকত হয় সেজন্য জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট আন্তরিক দোয়ার আবেদন করছি।

❑ গত ১২ই জানুয়ারী, ২০০১ তারিখ রোজ শুক্রবার মোসাম্মদ সুলতানা রাজিয়া আসমা পিতা- জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন, গ্রাম ও পোঃ সখিপুর, থানা- ভেদরগঞ্জ, জিলা- শরীয়তপুর-এর বিবাহ জনাব মোহাম্মদ এহীয়া, পিতা মৃত মোহাম্মদ মইনউদ্দিন, ৪ বকশি বাজার রোড, ঢাকা-এর সাথে টাকা ২৫,০০০/= মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী. সিলসিলা এই বিবাহের এলান করেন। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আব্দুল কাদির ভুইয়া
সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

সন্তান লাভ

আমার কনিষ্ঠ ছেলে, মৌড়াইল, বি.বাড়ীয়া নিবাসী শেখ জাকারিয়া আহমদ এবং তার বিবি কোহিনুর পারভীনকে ১৬ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখে দিবাগত রাত্রে আল্লাহ্তাআলা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। জন্মের পূর্বে পিতা মাতার দরখাস্ত অনুযায়ী ছেলেকে ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবজাতক এবং মাতা সুস্থ আছেন। এই শিশুকে যেন আল্লাহ্ সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু দান করেন এবং ছেলেটির ভবিষ্যতে মুত্তাকী, মেধাবী এবং খাদেমে দীন হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। নবজাত শিশুটি জনাব মরহুম আব্দুল ওয়াহেদ খন্দকার সাহেবের দৌহিত্র এবং খাকসারের পৌত্র।

শেখ আব্দুল আলী, সেক্রেটারী ওসীয়্যত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি.বাড়ীয়া

প্রশ্ন-উত্তর

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ডাঃ হরিলাল বাবু

প্রশ্নের উত্তর দেয়া হচ্ছে ঃ

প্রশ্ন ঃ জয়বাতুল হক্ক (৩য় সংস্করণ ১৯৯১) ৮৯ পৃষ্ঠায় ১৯তম লাইন থেকে (পৃষ্ঠার শেষ পর্যন্ত) বাইবেলের "ইউসুফিস"-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র বাইবেল পড়ে 'ইউসুফিস" নামের কারো ঘটনা তো দেখতে পাইনি। এই ইউসুফিস সম্বন্দে বাইবেলে কোথায় লেখা আছে ?

উত্তর ঃ 'ইউসুফিস'-এর ঘটনা New life of Tesus - by D. F. Straus, Vol-1, Page 410, পুস্তকে আছে। আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মূল পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়া-এর পঞ্চম খন্ডের পরিশিষ্টের ১৮৩ পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট পুস্তকের উদ্ধৃতিটি দেখেছি। সেখানে বাইবেলের কোন উল্লেখ নেই। মুদ্রণ হেতু বা অনুবাদকের অসতর্কতার কারণে 'বাইবেল' শব্দটি কোনভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বরাহীনে আহমদীয়ার মূল (উর্দূ) পুস্তক আমাদের নিকট রয়েছে। আপনি দেখতে চাইলে আমরা উহার ফটোকপি পাঠাতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ৬ - টিকা ১৭৩ রেফারেন্স দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ঃ২ - মন্তব্য ঃ এখানে মহানবী (সঃ)-এর ১০ হাজার সাহাবী নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করার মত কোন বাক্য বা ইংগিত নাই।

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের জবাব দেবার পূর্বে হরিলাল বাবুর নিকট বিনীতভাবে নীতিগত কয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রথমতঃ ভবিষ্যদ্বাণী অধিকাংশ সময়ই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়ে থাকে। আর বাইবেল অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে লিখিত ছিলো না তা-ও সবারই জানা। এমন কি বহু বার যে বাইবেলে তহরীফ ও তবদীল বা পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে তা-ও সবারই জানা। সুতরাং আমরা মনে করি এতে ইঙ্গিতেও যদি কোন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা বুঝায় তাহলেও তা-ই যথেষ্ট বলে মনে করা উচিত। যেখানে যেখানে ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পায় বাইবেলের অনুবাদকেরা তা রদবদল করে দিয়েছেন বা এমনভাবে অর্থ করেছেন যা সত্য থেকে অনেক অনেক দূরে। যেমন হিব্রু বাইবেলে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে 'মুহাম্মদীম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজীতে এর অর্থ করা হয়েছে "All together lovely' এবং বাংলায় করা হয়েছে 'সর্বতোভাবে মনোহর' (পরম গীত- ৫ঃ১০, ১৬)। সুতরাং এথেকে কি কেউ 'মুহাম্মদ' নাম জানতে পারবেন ? প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট টীকায় দ্বিতীয় বিবরণের যে অধ্যায়ের উল্লেখ করছেন তা ৩২ না হয়ে হবে ৩৩। পরবর্তীকালে এর অনুবাদে দশ হাজারের স্থলে 'অযুত' 'অযুত' করা হয়েছে। 'দশ হাজার' সম্বলিত ইংরেজী বাইবেল আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

প্রশ্ন ঃ ৭ টিকা ১৫০৮ এ বাইবেলের ১৮ঃ৩২ শ্লোক দ্বারা সমর্থিত কথাটি ঠিক নয়। বোধগম্য নয়। এখানে দশজন পুরুষ তা বলা হয় নাই। **দশজন পুরুষ মহিলা যাই হোক না কেন সেই শহর বিনষ্ট হবে না। যেহেতু সেই শহর বিনষ্ট হয়েছিলো।** অতএব প্রমাণিত যেখানে দশজন ছিলো না লুত এবং তার দুই মেয়ে ছিলো বাইবেলের এই কথা এই টিকা বা আয়াত দ্বারা মিথ্যা প্রমাণ হয় না। এখানে 'হুম' দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব বুঝালে – উক্ত প্রেরিতগণকেও বুঝাতে পারে।

উত্তর ঃ হরিলাল বাবু 'হুম' দ্বারা দুই দূত'কে বুঝাতে চেয়েছেন। দু'জন হ'লে 'হুমা' শব্দ ব্যবহৃত হতো। সুতরাং যারা সেখান থেকে বের হয়েছিলো তারা লূত (আঃ)-এর কন্যাদ্বয় ব্যতিরেকে দু'এর অধিক পুরুষ ছিলো একথাই প্রমাণিত হয়। হরিলাল বাবুর প্রশ্নে চিহ্নিত অংশটুকু আমাদের বোধগম্য হলো না।

প্রশ্ন ঃ ৮ টিকা ১৭০৫ ঃ টিকার মর্মার্থের সাথে ৪৮ঃ৩০ খাপ খায় না। কারণ, মুসায়ী শরীয়ত উপেক্ষিত হবে মুসা ও ইসার অনুসারীগণ, ধর্মপরায়নতা ভুলে যাবে এ রকম ইঙ্গিত এখানে নেই।

উত্তর ঃ ১৭০৫ নং টীকায় হযরত মূসা (আঃ)-এর একটি কাশ্‌ফী সফরের বর্ণনা করা হয়েছে। গভীরভাবে এর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, একদিন মুসায়ী বিধানের কার্যকারিতা এবং তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী ইঞ্জিলের কার্যকারিতা রহিত হয়ে মুহাম্মদী শরীয়ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। আজ প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় ইহা সত্য যে, মূসায়ী বিধান অকার্যকর হয়েছে এবং তদ্‌সঙ্গে মূসা (আঃ)-এর অনুরূপ এক নবী গুণে ও মহিমায় তাঁর (আঃ) চেয়ে অনেক শ্রেয় ও মর্যাদাবান নবী হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সত্তায় পরিপূর্ণ ও শেষ বিধান কুরআন করীম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আজ বিশ্বের কোণে কোণে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আহমদী জামাতের চেষ্টায় কুরআনী বিধান ও হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদর্শ প্রচারিত প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ৪৮ঃ৩০ আয়াতে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের উত্তম চরিত্র ও আদর্শের বর্ণনা এসেছে। আর এর উল্লেখ তাওরাতে ও ইঞ্জিলেও এসেছে (দ্বিঃবিঃ ৩৩-২)। এ আয়াতে রূপকভাবে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথা বলা হয়েছে তেমনই শেষ যুগে ঈসা ইবনে মরিয়ম রূপে তাঁর (সঃ) দ্বিতীয় আগমন তথা মুহাম্মদী মসীকেও রূপকভাবে বুঝানো হয়েছে (মথি ১৩ঃ৩৮)। মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর দল অতি নগণ্য অবস্থা থেকে একদিন সারা বিশ্বে এক মহা মহীরূহে পরিণত হবে সে ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যাদের চোখ আছে তারা দেখতে পাবে। আহমদী জামাত কত ক্ষুদ্র থেকে আজ সারা বিশ্বের ১৭০টি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ণ বিজয় এখনও সাধিত না হলেও দলীল প্রমাণ নীতি, শিক্ষা ও আদর্শের ক্ষেত্রে যে সারা বিশ্বে ইহা বিজয় লাভ করছে ও করতে যাচ্ছে তা বোধ করি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অন্যথায় এ আয়াতের এর চেয়ে অন্য কোন ভাল ব্যাখ্যা কেউ করিয়ে দেখিয়ে দিক।

প্রশ্ন ঃ ৯ ২৯ঃ১৫ আয়াতে (আপনারা নুহ এর ৯৫০ বৎসর এর যে ব্যাখ্যা করেছেন এ প্রেক্ষিতে) মনে হয় নূহের জাতীর লোক যখন চরম বিপথগামী হয়েছিলো তাঁর ৯৫০ বৎসর পর তখন মহাপ্লাবন হয়েছিলো অর্থাৎ প্লাবনের সময় তিনি স্বয়ং ছিলেন না। যদি তাই হয় তাহলে প্লাবনের সময় নৌকায় ওঠেছিলেন নূহ এর কোন খলীফা যিনি তার জাতীর শেষ সতর্ককারী ছিলেন– নূহ এর ৯৫০ বৎসর তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল না এর দ্বারা উপরোক্ত ব্যাখ্যা বুঝায় কিনা?

উত্তর ঃ হরিলাল বাবু যদি উপরোক্ত আয়াতের অধীন ২২৪৩ টীকাটি মনযোগ দিয়ে পড়তেন তাহলে তার এ ধোঁকায় পতিত হ'তে হতো না। কোন নবীর বয়স কত এটা মুখ্য বিষয় নয়। তাঁর কর্মের বয়সটাই হলো বড় কথা। হযরত নূহ (আঃ)-এর জীবদ্দশায়ই প্লাবন হয়েছিলো। কারণ তাঁকেই নৌকো নির্মাণ করতে বলা হয়েছিলো। এখানে কুরআনের শৈল্পিক বর্ণনার একটি উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর, অবস্থান করা' বলা দ্বারা তাঁর বিধানের ৫০ বছরের অগ্রগতির যুগ এবং ৯৫০ বছরের অধঃপতনের যুগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। ৯৫০ বছর পরে তাঁর বিধান অকার্যকর বা রহিত হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ১০ ইহুদীরা উযায়ের নামক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বিশ্বাস করে এর প্রমাণ কি? ১৫ জুন ১৯৯৯ সংখ্যায় আহমদীতে ২৭ পৃষ্ঠায় জনৈক মুতিউর রহমানও এ তত্ত্ব দিয়েছেন ইহুদীদের কোন ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স না দিয়েই।

উত্তর ঃ উযায়ের বা ইয্‌রা খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে বাস করতেন। ইয্‌রা একটি হিব্রু শব্দ। সম্ভবতঃ আযারিহাহ্ থেকে উৎপত্তি হয়েছে অর্থ-খোদা সাহায্য করেন। তিনি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরোহিত সেরাইয়াহ্‌র বংশধর ও নিজেও যাজক-স্বভাব একজন সদস্য ছিলেন এবং ধর্মযাজক ইয্‌রা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন আর ইহুদী ধর্মের উন্নতি সাধনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইসরাঈলী নবীগণের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। মদীনার ইহুদীগণ ও হাযরামাউতের একটি ইহুদী ফিরকা তাঁকে 'খোদার পুত্র' বলে বিশ্বাস করতো। রব্বিগণ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর নাম যোগ করে থাকে।

রেনান (Renan) তার প্রণীত 'ইহুদী জাতির ইতিহাস' (History of the people of Israil) পুস্তকের ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, ইহুদী জাতির নিশ্চিত সংবিধান ইয্‌রার আমলেই কোন এক নির্দিষ্ট সময় হ'তে আরম্ভ হয়েছিলো। রব্বিয়দের সাহিত্যে তিনি নিয়ম প্রণালী বা আইন কানুনের যোগ্য মাধ্যমরূপে বিবেচিত হতেন, যদি না পূর্বাহ্ণেই হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপরে শরীয়ত নাযেল হ'ত। তিনি নিহিমিয়ার সহযোগিতায় কর্ম সম্পাদন করেছিলেন আর ১২০ বছর বয়সে বেবিলনীয়াতে মৃত্যুবরণ করেন (যিউ এনসাইকো ঃ ও এনসাইকো বিবঃ)।

'Son of God' বা 'খোদার পুত্র' বা অমৃতের সন্তান' বল্লেই যে খোদার জাত পুত্র মনে করতে হবে তার কোন কারণ নেই। নবীরা সকলেই এক অর্থে খোদার পুত্র। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তারা খোদার পক্ষ থেকে সারা জীবন কাজ করে থাকেন এজন্যে তাদেরকে 'খোদার পুত্র' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

- নির্বাহী সম্পাদক

৭৭তম সালানা জলসায় আকীকা ও বিশেষ কুরবানী দাতাদের নামের তালিকা

১। মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ্- ফাজিলপুর বিডিআর নওগাঁ

২। মোহাম্মদ সানাউল হক, U.S.A

৩। সাইদুর রহমান শিহাব
পিতা ঃ মাহমুদ আহমদ
৭১৪, দক্ষিণ শাহজাহানপুর

৪। আমাতুস সামি (অইশি)
পিতা ঃ আকবর আহমদ নাটাই

৫। আমাতুস জামি (অদিতি) নাটাই
পিতা ঃ আকবর আহমদ

৬। মিস (অইশি)
পিতা ঃ মাসুদ আহমদ
মাতা ঃ নূসরত জাহান

৭। মোহাঃ ইয়ামীন মস্তান
পিতা ঃ মোহাঃ রফিক মস্তান, চাঁদপুর

৮। জনাব ফজলুর রহমান
পিতা ঃ জনাব মোঃ শামসুর রহমান
ক্যালিফোর্নিয়া, ইউ, এস, এ

৯। জনাব ফজলুর রহমান
পিতা ঃ মরহুম হাবিবুর রহমান
ফ্রুট মার্চেন্ট

১০। হাশের আহমদ মুবাশ্বের রুদ্র
(ওয়াকফে নও)
পিতা ঃ মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের (মোয়াল্লেম)
মাতা ঃ মোসাম্মৎ ফেরদৌশী মোবাশ্বের
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিতি হোন

মুহাম্মদ তা'রীফ হোসেন (সাদ)
ওয়াকফে নও নং-৫৬৯৪ বি
পিতাঃ মুহম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম
দাদাঃ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
গ্রামঃ টেক্স দিঘির পাড়, পোঃ- মাহিগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর

এস, এম সানাউল্লাহ্
ওয়াকফে নও নং-৯৪৪৭ এ
পিতা ঃ এস এম, নঈম উল্লাহ্
দাদা ঃ মরহুম মৌলভী ছলিম উল্লাহ্
নানা ঃ আলী আহমদ লস্কর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা

অষ্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর সাহেবের বাণী

আশা করি আল্লাহ্‌র ফযলে কুশলে আছেন। বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৭৭তম সালানা জলসায় যোগদানের জন্য আপনার প্রেরিত নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। নব শতাব্দীর এই প্রথম জলসার সার্বিক সফলতা ও আশীষমণ্ডিত হবার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বিশেষ ফযল ও নিরাপত্তা বর্ষিত করুন। জলসায় আগত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমানদের খেদমতে আমাদের সালাম ও দোয়ার আবেদন করছি। ১৪, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল আমাদের সালানা জলসা সিডনীতে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আপনাকে আমাদের জলসায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং দোয়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের সহায় হউন।

- মাওলানা মাহমুদ আহমদ
ন্যাশনাল আমীর, অষ্ট্রেলিয়া জামাত

আপনার পত্র পেলাম

একটি তবলীগি পত্র ঃ

ইমতিয়াজ ভাই,

সালাম ও ভালবাসা নিন। আহমদীয়ত সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এজন্য আমি একটু কষ্ট স্বীকার করে আপনাকে লিখছি। আশা করি নিরপেক্ষ ও পবিত্র মন নিয়ে আমার লেখাটি পড়বেন।

আহমদীয়ত কী ? মুসলমানদের মধ্যে নূতন এ জামাত কেন তৈরী করা হ'ল ?

আপনি যেহেতু হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দাবীদার, তাই আপনার উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আমি বিণীতভাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত বুযূর্গ মোল্লা আলী কারী (রহঃ)-এর মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা পুস্তক সরাহ আল্ মেশকাত 'মেরকাত' এর প্রথম খন্ড –১৬২নং হাদীসের ব্যাখ্যা–"ফাতিলকা ইসনানি ওয়া সাবউনা ফিরকাতুন কল্লুহুম ফিন্নার ওয়াল ফিরকাতুন নাজিয়াতুন আহলু সুন্নাতিল বায়যায়াল মুহাম্মাদিয়াতি ওয়াত্‌তারিকাতিন নাযিয়াতিল আহমদীয়াত।"

১৬২নং হাদীসে হুযূর (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন উম্মতে মুহাম্মদীতে ৭৩ ফিরকা বা মতবাদ সৃষ্টি হবে। আর এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আপনাদের মাযহাবের সর্বজন বুযূর্গ বলেছেন ঃ (উপরোক্ত আরবী উদ্ধৃতিটির বাংলা অর্থ) "ঐ সকল ৭২ ফিরকা অগ্নিতে থাকবে আর মুক্তিপ্রাপ্ত হ'ল সেই আহলে সুন্নাত মুহাম্মদীর পথ যা আহমদীয়ত নামে খ্যাত হবে।"

এখন প্রশ্ন হ'ল উম্মতে মুহাম্মদীতে কি ৭৩ ফিরকা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে? প্রশ্নটি খুবই তাৎপর্যপুর্ণ। কারণ, নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ৭৩ ফিরকা যখন হবে, তখন খাঁটি ইসলামী ফিরকা মাত্র থাকবে একটি আর ৭২টি ভ্রান্ত। বর্তমান যামানায় যে মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টি বা তারও বেশি ফিরকা সৃষ্টি হয়েছে তা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ, মাদ্রাসায় আলেম শ্রেণীতে পাঠ মেশকাত শরীফের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারী উক্ত বই-এ স্বীকার করেছেন যে, বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টি ফিরকা সৃষ্টি হয়ে গেছে। উক্ত লেখক মাওলানা নিজেকে হানাফি মাযহাবের অনুসারী পরিচয় দিয়েও হানাফী মাযহারের সর্বজনমান্য বুযূর্গ আলী কারী (রহঃ) উক্ত হাদীসটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সুকৌশলে এবং কি অভিপ্রায় এড়িয়ে গেলেন তা রহস্যময়। তবে মেশকাত শরীফের যতগুলি ব্যাখ্যামূলক পুস্তক বেরিয়েছে তার মধ্যে 'মেরকাত' শারাহ আল মেশকাত শ্রেষ্ঠ একথাও তিনি লিখেছেন। ইমতিয়াজ ভাই, আপনি কি জানেন, কেন উক্ত মাদ্রাসার হাদীস বই-এ হানাফী মাযহারের সর্বজন মান্য বুযূর্গের ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে? - তার কারণ, সত্যি সত্যি উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। ৭২টি ফিরকা হওয়ার পর যে ফিরকাটি হয়েছে তার নাম আহমদীয়ত। এটা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামাত। সত্যকে জানলে মানতে হবে এজন্য কি আপনিও মাদ্রাসার হাদীস বইটির লেখকের মত বা বর্তমান সময়ের অনেক আলেমের মত সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাবেন ? সত্যকে মানতে হবে এই ভয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং হঠকারিতা করা বনীইস্রায়েলদের স্বভাব। মুহাম্মদ (সঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 'আমার উম্মত বনী ঈস্রায়েলের মত হয়ে যাবে' এটার পূর্ণতা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন; তবে আপনিও উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষস্থল হতে চান কিনা কে জানে।

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোন সময় আসবেন?

আমি আপনাকে জানিয়েছি, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) প্রতিষ্ঠিত জামাতের নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত। আপনি হয়ত প্রশ্ন করবেন ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কি এসে গেছেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আপনাকেই জিজ্ঞেস করব, আপনি যেহেতু একজন আলেম, আপনিই হাদীস থেকে দেখিয়ে দেন তো ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোন্ সময় আসার কথা– আপনি যদি বনী ইসরাঈলী আলেমদের মত হন, তাহলে হয়ত হাদীস এর সুস্পষ্ট উক্তিগুলি এড়িয়ে যাবেন। থাক, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন বিষয়ে সময় নির্দিষ্ট করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলির কয়েকটা জানাচ্ছি আপনাকে।

১. আবি কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল (সাঃ) বলেছেন, ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত লক্ষণ সেই দুইশত বৎসর পর দেখা যাবে যা হাজার বৎসর পর আসবে। মেশকাত, কিতাবুল ফিতান)।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করার পর কি হাজার বৎসরের পর দুইশত বৎসর অর্থাৎ ১২ (১০০০+২০০) ১২০০ বৎসর অতিবাহিত হয় নি? ক্যালেন্ডার দেখুন হিজরী কত সাল -

২. 'নজমুস সাকেব' দ্বিতীয় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা – "ইয়া মাযাত, আলফা মিয়াতানে ওয়া আর বাউনা সানতান ইয়াবআসু লাহুল মাহ্‌দীয়া।" অর্থাৎ এক হাজার দুইশত চল্লিশ বৎসর পর ইমাম মাহ্‌দী আবির্ভূত হবেন। নবী (সঃ)-এর মৃত্যুর পর এক হাজার দুইশ' চল্লিশ (১২৪০) বৎসর অতিবাহিত হয়েছে কি?

৩. আল্লামা ইমাম শি'রানী (রাঃ) তার বিখ্যাত 'আল্ ইউআকিত ওয়াল জওয়াহের' এ লিখে গেছেন ঃ 'মৌলুদুহু লায়লাতান নিস্‌ফে মিনশা'বানা সানাতা খামসিনা ওয়া মিয়াতানে বা'দাল আলফে, অর্থাৎ 'ইমাম মাহ্‌দীর জন্ম বারশ' পঞ্চাশ হিজরীর শাবান মাসের ১৪ তারিখ হবে।

আমি যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কথা লিখছি এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জন্ম ১২৫০ হিজরীর শওয়াল মাসের ১৪ তারিখে হয়েছে। তারিখের সামান্য গরমিল কোন ধর্তব্য বিষয় নয়।

ইমতিয়াজ ভাই, আপনি আমাকে 'তাজ কোম্পানী প্রকাশিত কোরান হাদিসের আলোকে ইমাম মাহ্‌দী (রহঃ) পুস্তকটি দিয়েছিলেন। আপনি উক্ত বইটির নামের দিকে লক্ষ্য করুন লেখক ইমাম মাহ্‌দীর পর (রহঃ) লিখলেন কেন? হাদীস এবং অন্যান্য কিতাবে তো আলায়হিস সালাম (আঃ) শব্দটি লেখা আছে। আর (রহঃ) তো মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণে পাঠ করা হয়। আখেরী জামানার এসব আলেমদের এটা কোন্ ধরনের কাজ বলবেন কি? যাক, উক্ত বইটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১. পৃষ্ঠা ৯ এ একটা হাদীস লিপীবদ্ধ করেছেন, আপনি উক্ত বইটির হাদীসটি মূল আবূ দাউদ শরীফের সাথে মিলান, এ হাদীসটি সম্বন্ধে স্বয়ং আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবনে আল্ আস বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ।

২. পৃষ্ঠা ১৭, এখানের লিপিবদ্ধ হাদীসটি - "তাহার আবির্ভাবের সময় পবিত্র রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে"। ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধের দেশসমূহে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধের দেশসমূহে উক্ত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। এ সময়টা ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক গ্রহণকৃত প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) উপস্থিতির সময়।

৩. পৃষ্ঠা ১৩, লাইন ৩-৮ এ লিপিবদ্ধ হাদীসে লেখক দেখিয়েছেন, মাহ্‌দী খোরাসান হতে আসবে। আবার ১১ পৃষ্ঠায় এক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, যেখানে লেখা মাহ্‌দী

মদীনা শরীফ থেকে আসবেন। এরূপ পরস্পর বিরোধী হাদীস পেশ করে লেখক কী বুঝাতে চেয়েছেন?

৪. পৃঃ ১০, লাইন ৪-৬ (হাদীস) ঃ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যতক্ষণ আমার বংশ হতে এক ব্যক্তি আরবের বাদশাহ্ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হবে না। তার নাম আমার নামে হবে।

উক্ত হাদীসে তো ইমাম মাহ্দীর উল্লেখ নেই। এক আরবের বাদশার কথা বলা হয়েছে। আর উক্ত হাদীসটির রাবীগণের একজন হলেন 'আসেম'। এই আসেম সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ আপত্তি তুলেছেন। দারকুৎনী বলেছেন, আসেমের স্মরণশক্তির অভাব ছিল।

৫. পৃষ্ঠা ১১,লাইন ৩-২০- এখানে উল্লিখিত হাদীসটি মাহদী বুঝায় এমন কোন শব্দ নেই। উক্ত হাদীস একজন খলীফার মৃত্যুতে মুসলমানের মধ্যে মতবিরোধ হবে, নবী (সঃ) তাই বলেছেন। আপনি মাদ্রাসা পাস করা মানুষ। মাদ্রাসা এবং কলেজে পাঠ্য ইসলামের ইতিহাস পুস্তকটি কি পড়েন নি? মাবিয়ার সম্বন্ধে ও আবদুল্লা ইবনে যুবায়ের সম্বন্ধে ইতিহাস দেখুন। হযরত মাবিয়ার মৃত্যর পর খেলাফত নিয়ে মতভেদ হয়ে ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় আসেন, মক্কাবাসীরা তাঁর অনিচ্ছাসত্তেও তাঁর হাতে বয়াত হয়। সিরিয়া শহর থেকে এজিদ সৈন্য প্রেরণ করে। মক্কা অবরোধকালে এজিদের মৃত্যু হয়। এজিদের মৃত্যুর পর ইরাকের ও সিরিয়ার ধার্মিক লোকেরা এসে যুবায়েরের হাতে বয়াত হন এবং তাকে খলীফা মনোনিত করেন। এজিদের মামার বংশধর বনুকালব বংশের ছিলো।

৬. পৃষ্ঠা ১৫ লাইন ৭- এখানে সত্য কথা বলেছেন, ইমাম মাহদী প্রচলিত মাদ্রাসা পাস করা আলেম হবেন না। সত্যই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ) মাদ্রসা পাস আলেম ছিলেন না। তবে তথাকথিত মাদ্রাসা পাস বিখ্যাত আলেমগণ ধর্মীয় বির্তকে তার নিকট পরাজিত হয়েছেন। বহু বড় বড় আলেম তাঁর বয়াত হয়েছেন।

এখানে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আপনার দেয়া বইটি থেকেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছিঃ

১. দাজ্জাল কখন আসবে?

উক্ত বই লেখক ৩৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস পেশ করেছেন 'আবদুল্লাহ্ ইবনে বোছর হইতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ভয়ংকর যুদ্ধ ও কনস্টান্টিনোপল বিজয় এই দুই এর মধ্যে ৬ বৎসর লাগবে সপ্তম বৎসরে দাজ্জাল বের হবে?

মন্তব্য ঃ ইতিহাসের বই পাঠ করে দেখুন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই সময়ে কনস্টান্টিনোপল বিজাতীদের দখলে ছিল। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ১৪৫৩ খৃঃ সুলতান মুহাম্মদ এটা জয় করে। কনস্টান্টিনোপল জয়ের পরের বৎসর তো দাজ্জাল বের হওয়ার কথা এখন আপনাকে বা বর্তমান আলেমদেরকেই জিজ্ঞেস করব দাজ্জাল কোথায় ? দাজ্জাল দেখিয়ে দেন। যদি দেখিয়ে দিতে না পারেন তাহলে বলব হাদীস বিশ্বাস করেন না?

২.দেখুন পৃষ্ঠা ৬৯, ৭-৮ লাইন ঃ সূরা কাহাফের প্রথমদিকে কয়েকটি আয়াত পড়লে দাজ্জাল থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

মন্তব্য ঃ আপনার কাছে কুরআন শরীফ আছে। বাংলা অনুবাদও আছে। সূরা কাহাফের প্রথম কয়েকটি আয়াতে কাদের বিষয়ে লেখা হয়েছে ? তাদের বিষয়ে নয় কি 'যারা বলে আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন' । 'আল্লাহ্ পুত্র গ্রহন করেছেন' এই মতবাদ কে বা কারা প্রচার করে ? খ্রীষ্টানরা নয় কি? তাহলে আপনিই বলুন দাজ্জাল করা হ'ল।

৩. পৃষ্ঠা ১০৬, লাইন ১০ 'দাজ্জাল সিরিয়া বা ইয়েমেনের সমুদ্রে আছে'।

মন্তব্য ঃ সিরিয়া বা ইয়েমেনের সমুদ্র কি বর্তমান যুগের মানুষের অজানা ? আপনারা দাজ্জালের যে কিচ্ছা শুনান, সে রকম দাজ্জাল কি দেখাতে পারবেন সেখানে ?

প্রসঙ্গ ইয়াজূজ ও মাজূজ ঃ

উক্ত বই এর ৭৭পৃষ্ঠা ২ লাইন হযরত নূহ (আঃ) ইয়াফেসের বংশধর। ইয়াফেসের বংশধরের লোক বর্তমান পৃথিবীর কোন্ জাতীতে অধিক ?

ইমতিয়াজ ভাই, ইয়াজূজ মাজূজ সম্বন্ধে 'যুলকিফল' নবীর সহীফা ৩৯ রুকু ১ আয়াতে আরো একটি ভবিষদ্বাণী আছে। " হে ইয়াজূজ, রোশের,মেশ্কের ও তুবলের অধিপতি,সদাপ্রভু (আল্লাহ্) তোমার বিপক্ষ । এখানে ইয়াজূজকে রোশ, মস্ক ও তুবলস্কের অধিপতি বলা হয়েছে।

ইমতিয়াজ ভাই, আপনি তাজ কোম্পানী প্রকাশিত ফজলুল করিম মোল্লা লিখিত বইটি দিয়েছিলেন। উক্ত বই নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলেন ইমাম মাহদী(আঃ) ও দাজ্জালের আগমনের নির্ধারিত সময় ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে। আরো জানতে পারলেন আহমদীয়ত কী? আহমদীয়ত হ'ল ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত ইসলামের নাজুক অবস্থায় সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ) প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী আন্দোলনের নাম। আপনি যেহেতু আলেম মানুষ, আপনি নিশ্চয় হাদীস পড়েছেন ইমাম মাহদী (আঃ)-এর খবর শুনার পর তাঁর হাতে বয়াত হওয়ার জন্য বরফের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হলেও যেতে হবে - এ রকম জোর তাগিদ দিয়েছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। আপনার আরেকটি প্রশ্ন ছিল, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন হয়েছে অথচ অধিকাংশ আলেম তাঁকে গ্রহণ করছে না কেন ? তার কারণ, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের লক্ষণাবলী নিয়ে আলেমগণ যে সব যয়ীফ হাদীস পেশ করে নিজেরা কল্পিত কাহিনী তৈরী করে নিয়েছেন সে অনুসারে তাঁর অবগমন হয় নি বলে। আপনি যে বইটি দিয়েছিলেন তাতে যে সব হাদীস পেশ করা হয়েছে তাতে ইমাম মাহদী বুঝায় এমন কোন শব্দ নেই কোন কোনটিতে। আর দাজ্জাল, ইয়াজূজ মাজূজ নিয়ে কল্পিত কাহিনী তৈরী করা হয়েছে অথবা হাদীসের রূপক অর্থের প্রকাশ্য অর্থগ্রহণ করায় আলেমগণ ভ্রান্তিতে পড়েছেন। আসল কথা হ'ল, ইমাম মাহদী (আঃ) কেন, তৎকালীন আলেমদের প্রচলিত ধারণা অনুসারে কোন নবীরই আগমন হয় নি, তাই তারা সমাগত নবীকে গ্রহণ করে নি। আপনি ইহুদীদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করুন তওরাতে, নবীদের সহীফায় ঈসা নবী (আঃ) সম্বন্ধে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সঃ) সম্বন্ধে যেসব ভবিষদ্বাণী ছিল তা পড়ে কেন তারা সেই নবীদের মানেন নি ? তাদের জবাব, আরে মিয়াঁ! সেই নবী আসার সময় হয়েছে নাকি ? কিয়ামতের আগে আসবে। তার আগে অমুক অমুক লক্ষণাবলী প্রকাশ পাবে। - বর্তমান আলেমগণও ইমাম মাহদী(আঃ)-কে মানতে পারেন নি ঠিক এই একই কারণে, একই অজুহাতে। তাদের ধারণা অনুসারে না এসে কুরআন এবং হাদীসের ধারণা অনুসারে আসা জরুরী সেটা অনুধাবনের সুবুদ্ধি হ'লে ধন্যবাদ আপনাকে সহ আলেমগণকে। যেহেতু এটা একটা চিঠি তাই এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। পরবর্তীতে আপনার সাড়া পেলে ইমাম মাহদী, দাজ্জাল, ইয়াজুজ, মাজুজ এবং আখেরী যমানার লক্ষণাবলী নিয়ে আলেমদের প্রচলিত ধারণার সঠিক এবং যুক্তি-সংগত ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করব।

– এম, এ, আউয়াল

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিগত বছরের নির্বাচিত ঘটনাক্রম

[২০০০ সালের সালানা জলসার পর এক বছর ঘুরে আমরা এখন ২০০১ সালের সালানা জলসার দ্বারপ্রান্তে। গত এক বছরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কিছু উল্লেখযোগ্য দিকের স্মরণ আমরা এ প্রবন্ধে করছি]

তবলীগের ময়দানে ক্রমবর্দ্ধমান সফলতা

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ময়দানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সফলতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৯৯ সালের যুক্তরাজ্য সালানা জলসা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ১,০৮,২০,২২৬ জনের বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে এ জামাতে দাখিল হওয়ার ঘোষণা দেন। যখন হুযূর (আইঃ) পরের বছর এর দ্বি-গুণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তখন এটিই ছিল অনেক বড় লক্ষ্যমাত্রা। তাই ২০০০ সালের ২৯ শে জুলাই হুযূর (আইঃ)-এর যুক্তরাজ্য সালানা জলসার মধ্যবর্তী দিবসের ভাষণ শোনার পূর্বে আমাদের মনে এ আকাঙ্ক্ষাই ছিল যে, ২ কোটির সুসংবাদ যেন আমরা শুনতে পাই।

কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা যাকে চান 'বে গায়রি হিসাব'-বেহিসেব দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এ সুসংবাদ আমরা শুনলাম যে, এক বছরে ৪,১৩,০৮,৩৭৫ জন বয়াত গ্রহণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৭০টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার মধ্যে এ বছরে নবাগত ১২টি দেশ হ'লঃ (১) সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (২) সাও টোমে এ্যান্ড প্রিন্সিপে, (৩) সেইশেলেস, (৪) সোয়াজিল্যান্ড, (৫) বোত্সওয়ানা, (৬) নামিবিয়া, (৭) ওয়েস্টার্ণ সাহারা, (৮) জিবুতি, (৯) ইরিত্রিয়া, (১০) কসোভো, (১১) মোনাকো এবং (১২) এ্যান্ডোরা।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে সবচে' এগিয়ে ছিল ভারত এবং আফ্রিকা মহাদেশ। হুযূর (আইঃ) মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর "কোটি কোটি বয়াত.........." সংক্রান্ত ইলহামের বরাত দিয়ে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন যে, শুধু ভারতে যেন এ বছর অন্ততঃ এক কোটি বয়াত হয়। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে যেখান থেকে ২ কোটি ১২ লক্ষের অধিক বয়াতের সংবাদ পাওয়া গেছে। আবার আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলো থেকেও সর্বমোট ২ কোটির অধিক বয়াতের খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, ভারতের বয়াতের মধ্যে ২৬ লক্ষাধিক করেছেন পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে।

হুযূর (আইঃ)-এর ইন্দোনেশিয়া সফর

গত বছরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল হুযূর আকদস (আইঃ)-এর ইন্দোনেশিয়া সফর। ইন্দোনেশিয়ায় পূর্বে কোন খলীফা কখনো সফর করেন নি। আর ইন্দোনেশিয়া জনসংখ্যার দিকে থেকে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। তাই এ সফর ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। পূর্বে ইন্দোনেশিয়া সফরের ক্ষেত্রে অনেক বাধা-নিষেধ ছিল। এসব সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে এ সফর অত্যন্ত বরকতপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। হুযূর আকদস (আইঃ) ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে ১৯শে জুন লন্ডন হতে যাত্রা করেন আর ১২ই জুলাই লন্ডনে ফিরে আসেন। হুযূর (আইঃ) ইন্দোনেশিয়ার ৭৫ তম সালানা জলসায় উপস্থিত ছিলেন যা ৩০ শে জুন থেকে ২রা জুলাই জাকার্তা থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরে পারুং-এ জামাতের কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ১৭/১৮ হাজার মেহমান উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা এম.টি.এ-র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২৩ শে জুন যোগজাকার্তায় এবং ৭ই জুলাই জাকার্তায় প্রদত্ত হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবাগুলিও এম.টি.এ.-র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

এ সফরে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান ওয়াহিদ হুযূর (আইঃ)-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। স্পীকার প্রফেসর আমীন রঈসের সাথেও হুযূর (আইঃ) মিলিত হন। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি স্বয়ং নদওয়াতুল উলামার একজন বিশিষ্ট নেতা এবং স্পীকার মোহাম্মদীয়া পার্টির একজন নেতা। এছাড়া জামাতের বাইরের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল Gadja Mada বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে `To Find Again the Prophetic Vision of Religion; `The New Paradigm of Islamic Thought in the Globalisation Era' শীর্ষক বক্তৃতা ও তৎপরবর্তী প্রশ্নোত্তর সভা। এরপর ২৯শে জুন রিজেন্ট হোটেলে `Indonesian Muslim Intellectuals Dialogue' আয়োজিত অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ) `Islam and the Prospect of Muslim Revival: Considering Existential Problems in the 21st Century' শীর্ষক বক্তৃতা এবং ৬ই জুলাই সারি প্যান প্যাসিফিক হোটেলে হোমিওপ্যাথির উপর বক্তৃতা করেন। এ অনুষ্ঠানগুলোও এম.টি.-র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

হুযূর (আইঃ)-এ সফর বিশাল এ দেশটির বিভিন্ন দ্বীপে ব্যাপক সফর করেন। হুযূর (আইঃ) পরবর্তীতে এক প্রশ্নোত্তর সভায় বলেছেন ৭০/৮০ হাজার বা এক লক্ষ লোকের সাথে তাঁর এ সময়ে সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রায় ৫ হাজার ব্যক্তি আহমদী জামাতে বয়াত গ্রহণ করে দাখিল হয়েছেন। ঐতিহাসিক এ সফরের সাথে একজন বিশিষ্ট গয়ের আহমদী ব্যক্তিত্বের নাম চিরতরে গেঁথে গিয়েছে। তিনি হলেন প্রফেসর দোয়াম। এ সফরের জন্য তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

কুরআন মজীদের প্রকাশনা

বিশ্বব্যাপী পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ছাপানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ফযলে এ বছরও অগ্রগতির সংবাদ পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্য জলসায় বর্ণিত রিপোর্ট অনুযায়ী তার পূর্ব পর্যন্ত ৫৩ টি ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল। সুদানী ভাষায় ২০ পারা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। আরো ১৪টি অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে। এগুলো হ'ল ঃ (১) বাউলে (আইভরী কোষ্ট), (২) কাতালান (স্পেন), (৩) হাঙ্গেরীয় (হাঙ্গেরী), (৪) কানরী (ভারত), (৫) কিকাম্বা (কেনিয়া) (৬) কিকঙ্গ (কেনিয়া), (৭) বেতে (আইভরী কোষ্ট), (৮) জুলা (আইভরী কোষ্ট), (৯) এতসাকো (নাইজেরীয়া), (১০) কিরিবাতি (কিরিবাতি/ফিজি), (১১) মাওরী (নিউজিল্যান্ড). (১২) খামের (কম্বোডিয়া), (১৩) উযবেক (উযবেকিস্তান) ও (১৪) খোসা (দক্ষিণ আফ্রিকা)। এছাড়াও কাযাখ, কিরঘিয ও কুর্দী অনুবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়ে চেকিং এর পর্যায়ে আছে।

মোখালেফাত ও শাহাদত

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে জামাত যতই উন্নতির দিকে ধাবমান ততই ঈর্ষা পোষণকারীদের অন্তর্জ্বালার ফলস্বরূপ মোখালেফাত অব্যাহত আছে। এ বছর পাকিস্তানে এ বিরোধিতা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারই বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে শাহাদতের ঘটনাগুলোতে।

৩০ শে অক্টোবর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের পস্রুর-মুরিদ্‌কে মহাসড়কের নিকট কিলা

কালারওয়ালার ঘটিয়ালিয়াঁ গ্রামের আহমদী মসজিদে ফজরের নামাযের অল্প পরেই দুই ব্যক্তি AK-47 রাইফেল সহ মসজিদে প্রবেশ করে। দরস ও কিছু এলানের পর তখন এক ভাই যেখানে তেলাওয়াত করছিলেন। তিনজন বাইরে থেকে এসে তাদেরকে দেখে প্রথমে ৩৫ বছরের যুবক আব্বাস আলী সাহেব একজনের রাইফেলের নল ধরে ফেলেন এবং ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করেন। কিন্তু, অপরজন তাঁর পেটে বন্দুক লাগিয়ে গুলি চালিয়ে দেয়। অপর দু'জন মসজিদের দরজা একটি লাগাতে পারলেও অপরটি দিয়ে ঘাতকরা ঢুকে পরে এবং নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। কিছুক্ষণ গুলি চালিয়ে ওপেন ফায়ারিং করতে করতে তারা পালিয়ে যায়।

চারিদিকে রক্ত আর ধোঁয়ার মধ্যেও ছিল 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি আর অবিচল ধৈর্যের দৃষ্টান্ত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগের নমুনা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছিল যখন একজনের সেবা করতে গেলেই সেই ব্যক্তি অপর ভাইয়ের দিকে ইশারা করছিলেন। জীবনের অন্তিম লগ্নেও তাঁরা এরূপ করেছেন। ঘটনাস্থলে সর্বপ্রথম মোহতরম ইফতেখার আহমদ সাহেব (৩৫) এবং তারপর মোহতরম শেহযাদ আহমদ সাহেব (১৬) শহীদ হন। নরোওয়াল হাসপাতালে নিতে নিতে মোহতরম আতাউল্লাহ সাহেব (৬৫) এবং মোহতরম আব্বাস আলী সাহেব (৩৫) শাহাদত লাভ করেন। এরপর আহতদের লাহোরে নেয়া হ'লে যেখানকার মেয়ো হাসপাতালে মোহতরম গোলাম মোহাম্মদ সাহেব (৬৮) শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদদের মধ্যে কেবল শেহযাদ সাহেবের একটি গুলি লেগেছিল, বাকিদের বেশ কয়েকটি করে। শহীদ ইফতেখার সাহেবের ১৫/১৬ টি গুলি লেগেছিল। গুরুতর আহতরা হলেন মোহতরম মাষ্টার মোহাম্মদ আসলাম সাহেব (৬১), মোহতরম নাদীম আহমদ সাহেব (২৪), মোহতরম তাসলীম আহমদ সাহেব (২০), মোহতরম শাহবায আহমদ সাহেব (৩৬), মোহতরম মোহাম্মদ বুটা সাহেব এবং মোহতরম নাসীর আহমদ সাহেব (৬১)।

আল্লাহ্র ফযলে জামাত ধৈর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। চোখে অশ্রু থাকলেও কাউকে চিৎকার হাহাকার করতে বা বিশৃংখলা অবস্থায় দেখা যায় নি। ঘাটিয়ালিয়াঁ তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল মাঠে আনুমানিক চার হাজার ব্যক্তি তাঁদের জানাযায় শরীক হন এবং ঘাটিয়ালিয়াঁ গোরস্তানে তাঁদের দাফন করা হয়।

এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সারগোদার নিকট তখ্ত হাযারাতে আহমদী মসজিদে 'ইশার নামাযের সময় একদল উগ্র বিরুদ্ধবাদী আক্রমণ করে। তারা কুড়াল, লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালাতে থাকে। আহতরা ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করলে মসজিদের ছাদে উঠে তাদেরকে আঘাত করা হয় এবং মরদেহ ছাদ থেকে গলিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। ঘটনাস্থলে মোহতরম আরিফ সাহেব, মোহতরম আসলাম সাহেব, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহতরম নাযির হোসেন সাহেব এবং মোহতরম মুযাফ্ফর আহমদ সাহেব শহীদ হন। ১৪ বছরের বালক মোহতরম মুদাস্সর আহমদ সাহেব হাসপাতালে শাহাদতের পেয়ালা পান করেন (ইন্না লিল্লাহে ....)। আরো দুজন গুরুতর আহত হন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর (আইঃ) ২৬শে জানুয়ারী, ২০০১ এর খুতবায় আপামর জনসাধারণের কল্যাণের জন্য দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বদ্দোয়ার জন্য পুনরায় তাগিদ করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশন-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৪-১৯৯৬ এর মধ্যে ৯৪ জন আহমদীকে শহীদ করা হয়, আরো ৭০ জনের উপর হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়, ৩৮টি মসজিদে অগ্নিসংযোগ, ক্ষয়-ক্ষতি করা হয় বা জোরপূর্বক দখলে নেয়া হয়, ১৫টি কবর উপড়িয়ে ফেলা হয় এবং ২৬টি ক্ষেত্রে দাফনের সময় বিশৃংখলা করা হয় বা দাফন কার্যে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

শাহাদতের ক্ষেত্রে আরেকটি ঘটনা যা আমরা জানতে পেরেছি তা ঘটেছে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানাতে। যেখানে ১৫ই এপ্রিল, ২০০০ তারিখে মোহতরম মৌলানা আব্দুর রহীম সাহেবকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফীল্ডগঞ্জ জামে মসজিদের ভিতরে আরো কয়েকজনসহ প্রহার করা হয়। মাথায় লাঠির আঘাতে তিনি প্রথমে জ্ঞান হারান। পরে পুলিশ এসে সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে, সেখানে তিনি শাহাদত বরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহে ....)। মৌলানা সাহেব দেওবন্দের ফাযেল পাশ ছিলেন এবং নও আহমদী ছিলেন। ১৯৮০ সালে ফাযেল সনদ লাভের পর ১৯৮১ সালে দওরা হাদীস এবং তারপর দেওবন্দ থেকে ফাযেলের সনদ অর্জন করেন। পশ্চিম বঙ্গে বিভিন্ন মাদ্রাসায় কাজ করার পর ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত হেড মুদাররেস ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর জামাতে ইসলামীর ইসলাম প্রচার বিভাগ, মালীর কোটলা এর পক্ষ থেকে তাঁকে পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশ ও হরিয়ানার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আহমদীতের অনেক বিরোধিতাও করেছেন। বক্তৃতা, বাহাস প্রভৃতিতে অংশ নিয়েছেন। ১৯৯৮ সালের জুন মাসে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি কাদিয়ানে আসেন। ফিরে গিয়ে গবেষণার পর নভেম্বর ১৯৯৮ এ তিনি বয়াত করেন। পরে এসেও সবাইকে পিছে ফেলে অনেক বড় মর্যাদা তিনি লাভ করলেন।

কাদিয়ান ও ক্যানাডা জলসার কিছু দিক

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রবর্তিত জলসার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্র ফযলে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কেবল তিনটি জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হ'ল। আর ইন্দোনেশিয়া জলসার কিছু ঝলক পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

কাদিয়ানের ১০৯ তম সালানা জলসা আল্লাহ্র ফযলে অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২১টি দেশের ৩৫ হাজার মেহমানের উপস্থিতিতে এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ানের স্কুল, কলেজ, জামেয়া প্রভৃতি সমস্ত ভবন ছাড়াও ১১২ একরের বিশাল প্রান্তরে তাবু টাঙিয়ে মেহমানদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, উপস্থিত ৩৫ হাজার মেহমানের মধ্যে ২৩ হাজারই ছিলেন নও মুবায়েঈন। জলসা উপলক্ষ্যে পাঞ্জাবের মূখ্য মন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল অত্যন্ত আন্তরিক এক বাণী পাঠিয়ে নিজে না আসতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন ও জামাতের কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন, সাবেক কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও এম.পি. রখুনন্দন লাল ভাটিয়া, প্রাদেশিক জনসংযোগ মন্ত্রী নাথা সিং দালম, সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রতাপ সিং বাজওয়া, সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী সরদার তারপর, রাজেন্দর সিং বাজওয়া, একজন ধর্মীয় নেতা সন্ত দর্শন সিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুক্ত রাজ্যের সালানা জলসায় এবার ৭৭টি দেশের ২৩,৪০৭ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জলসার পরে হুযুর (আইঃ) বর্ধিষ্ণু অতিথি সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রেখে এ নির্দেশনা দেন যে, এখন ইসলামাবাদও ছোট হয়ে গেছে এবং আরো বড় জায়গা খুঁজতে হবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা বাণী পাঠিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, গিনি-বিসাউ-এর রাষ্ট্রপতি কুম্বা ইয়ালা, তুভালুর গভর্নর জেনারেল তোমাসি পায়া, তানজানিয়ার রাষ্ট্রপতি বেনজামিন উইলিয়াম এস্কাপা, বুরকিনা ফাঁসূর রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে তাঁর উপদেষ্টা সালীফ দেয়ালো প্রমুখ।

ক্যানাডার জলসার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বায়তুল ইসলাম মসজিদের নিকটে ২৬০টি বাড়ির

পরিকল্পনাবিশিষ্ট আহমদী হাউজিং এর প্রতিষ্ঠা এবং ক্যানাডার অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত হয়ে জলসার উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান। এদের মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রধান মন্ত্রী জো ক্লার্ক, নাগরিকত্ব ও অভিবাসন মন্ত্রী এলিনর কাপলান, অর্থমন্ত্রী পল মার্টিন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আর্ট এগল্টন, কেন্দ্রীয় সাংসদ জিম পিটারমন, অন্টারিও প্রদেশের প্রাদেশিক আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী টনি ক্লেমেন্ট প্রমুখ।

হুযূর (আইঃ)-এর অসুস্থতা ও আরোগ্য লাভ

বিগত বছরের শেষ ভাগে এসে একটি বিষয় যা বিশ্ব জুড়ে আহমদীদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং সর্বোপরি ধৈর্য ও দোয়ার মধ্যে নিমজ্জিত রাখে তা হ'ল হুযূর (আইঃ)-এর অসুস্থতা। অসাধারণ পরিশ্রমের ফলস্বরূপ খুব সম্ভবতঃ অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হুযূর (আইঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৮ই ডিসেম্বর থেকে হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবার মাধ্যমে পুনরায় আমরা যুগ-খলীফার তাজা নির্দেশনার সাথে যুক্ত হই। হুযূর (আইঃ) অনেকটা সুস্থ হলেও দোয়া জারী রাখার আবেদন করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে পূর্ণ ও স্থায়ী আরোগ্য দান করুন, তাঁর হাতকে শক্তিশালী করুন এবং তাঁর আয়ূ ও নির্দেশাবলীর মধ্যে বরকত দান করুন।

আহমদী ওয়েবসাইট শ্রেষ্ঠ ইসলামী ওয়েবসাইট হিসেবে 'টাইমস্ ইন্ডিয়া' কর্তৃক স্বীকৃতি

ভারতের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' সম্প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইন্টারনেট ওয়েবসাইট WWW. ahmadiyya. Com কে ইসলামের উপর শীর্ষস্থানীয় ওয়েবসাইট (Top Website or Islam) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের ২২টি ইসলামী ওয়েবসাইটের উপর জরীপের ফলাফলে এটি ১ম স্থান অধিকার করে। উল্লেখ্য যে, ভারতের কেরালা রাজ্য জামাতের ব্যবস্থাপনায় এরই আরেকটি শাখা ওয়েবসাইট রয়েছে সেটিও ১৬ তম স্থান লাভ করে। এ ওয়েবসাইটগুলো বিশ্বব্যাপী আহমদীদেরকে একসূত্রে গাঁথার পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে তথ্যবহ উপস্থাপনা ও ইন্টারনেটে জামাতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের খন্ডনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

সংকলন ঃ আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন্ তারেক

নতুন সহস্রাব্দে আহমদীয়ত

"হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহূ বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লি ইউযহিরাহু আলাদ্দীনে কুল্লিহী ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকূন।"

অনুবাদ ঃ "তিনিই (আল্লাহ্) তার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন" (সূরা সাফ্ফ ঃ ১০)।

আজ হতে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে, এক অন্ধকার যুগে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদপদ (তৎকালীন বিশ্বে) নগরী মক্কায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর (সঃ) উপর অবতীর্ণ হয় পরিপূর্ণ শরীয়ত গ্রন্থ পবিত্র কুরআন, অর্পিত হয় পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলামকে জগতে প্রচারের মহান দায়িত্ব। তিনি তাঁর নবুওয়তের সুদীর্ঘ তেইশটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাঁর (সঃ) উপর অর্পিত দায়িত্বকে পালনের জন্য। তখন উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে (সঃ) জানিয়ে দেন- "তোমাকে সত্য ও পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলামকে দিয়ে পাঠিয়েছি- ইহাকে পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য।" ইসলামের প্রাথমিক যুগে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় ইহা (ইসলাম) ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণীর আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু এর পরও এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন আজ পর্যন্ত মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করে নি। আল্লাহ্‌তাআলার ভবিষ্যদ্বাণী কখনও অপূর্ণ থাকে না। সময়ের ব্যবধানে হলেও তা পূর্ণ হতে বাধ্য। এ সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরকারগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ প্রতিশ্রুত বিশ্ব বিজয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন তথা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগে সম্পন্ন হবে। আর আজ আমরা সেই প্রতিশ্রুত মহামানবের যুগে, সেই বিজয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। এ সন্ধিক্ষণের একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলাই এ প্রবন্ধের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

প্রতিশ্রুত মহামানব, যাঁর হাতে ইসলামের বিশ্ব বিজয় অবধারিত ছিলো তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। ১৮৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অখ্যাত, অপরিচিত, সেকেলে (গন্ডগ্রাম) গ্রাম কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮২ সালে তিনি প্রথম আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট বলে দাবী করেন। আরম্ভ করেন এবং জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ, ইমাম মাহদী উম্মতি নবী, ও চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বলে দাবী করেন। তাঁর (সঃ) এ দাবী তৎকালীন অধিকাংশ উলামা মেনে নিতে পারেন নি। তারা তাঁকে (আঃ) কাযযাব, দাজ্জাল, ভন্ড, কাফির, মুরতাদ, ব্রিটিশের দালাল (নাউযুবিল্লাহ) প্রভৃতি বলে ফতোয়া দেয়। তাঁকে ও তাঁর (আঃ) জামাতকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, উঠে পড়ে লাগে। তখন শুধু মুসলমানরা নয়, আর্য সমাজী ও খৃষ্টানরা তাঁর (আঃ) প্রকাশ্য বিরোধিতা করে। তাদের নেতৃত্ব দেয় মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী, সানাউল্লাহ অমৃতসরী, পন্ডিত লেখরাম, আব্দুল্লাহ্ আথম, আলেকজান্ডার ডুই, খৃষ্টান সিরাজউদ্দিন প্রমুখ। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেয়ে তিনি (আঃ) ঘোষণা করেন–

"দেখ ঐ যুগ আসছে, বরং নিকটে এসে গিয়েছে, যখন আল্লাহ্‌তাআলা এই সিলসিলাকে পৃথিবীতে অত্যন্ত বরণীয় করে তুলবেন। এটি পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে প্রসার লাভ করবে এবং দুনিয়ায় ইসলাম বলতে একমাত্র এই সিলসিলাকেই বুঝাবে। এ সেই আল্লাহ্‌তালার বাণী, যাঁর কাছে কোন কিছু অসম্ভব নয় (তোহফায়ে গুলড়বীয়া)।

"এখন সেই দিন নিকটে এসে যাচ্ছে, যখন সত্যতার সূর্য পশ্চিম দিন থেকে উদিত হবে। এবং ইউরোপ সত্য খোদার সন্ধান লাভ করবে" (তাযকেরা পৃষ্ঠা-২৯৪)।

"আমি তোমার তবলীগকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো।" (তাযকেরা)

আজ আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর একশ' বার বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছি, কীভাবে আল্লাহ্‌তাআলা জামাতে আহমদীয়াকে জগতে অর্ভূতপূর্ব সফলতা ও বিজয় দিয়ে তাঁর (আঃ) র ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করে চলেছেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) প্রথম যখন বয়াত নেন তখন তাঁর হাতে মাত্র চল্লিশজন পবিত্র হৃদয়ের ব্যক্তি বয়াত নিয়েছিলেন। আর আজ (২০০০ সাল) তাঁর (আঃ) চতুর্থ খলীফার হাতে এক বছরে বয়াত নিয়েছেন ৪ কোটি ১৩ লক্ষ ৮ হাজার ৩শ' ৭৫ জন। তিনি (আঃ) মৃত্যুর সময় ৪ লক্ষ অনুসারী রেখে যান আর আজ (২০০১ সাল ফেব্রুয়ারী মাস) তাঁর (আঃ) অনুসারী নয় কোটিরও উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশা করি ২০০১ সালের (নিউ মিলেনিয়ামের) জুলাই মাসের অনুষ্ঠিত সালানা জলসার সময় এ সংখ্যা গত বছরের দ্বিগুণে এসে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ্ জামাতের এ অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি ও সফলতাকে বুঝানোর জন্য নিম্নে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো ঃ

বয়াত ঃ

প্রথম বয়াত ১৮৮৯ ইং সনের ২৩শে মার্চ – ৪০ জন

আর্ন্তজাতিক বয়াত

১৯৯৩ –	২,০৪,৩০৮	জন
১৯৯৪ –	৪,১৮,২০৬	"
১৯৯৫ –	৮,৪৫,২৯৪	"
১৯৯৬ –	১৬,০৬,৭২১	"
১৯৯৭ –	৩০,০৪,৫৮৪	"
১৯৯৮ –	৫০,০৪,০০৬	"
১৯৯৯ –	১,০৮,২০,২২৬	"
২০০০ –	৪,১৩,০৮,৩৭৫	"

জামাত ঃ এ পর্যন্ত (২০০০ সাল) সারা বিশ্বে ১৭০টি দেশে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে তের হাজারের অধিক জামাত কায়েম হয়েছে। এগুলি প্রতিনিয়ত সত্যিকার ইসলাম এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সর্বত্র প্রচার করে যাচ্ছে। এ প্রসংগে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি প্রণিধানযোগ্য–

(১) ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকূলীয় এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। শীঘ্রই গোল্ডকোষ্টের সকল অধিবাসীর খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা-নিরাশায় পর্যবসিত হবে। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহমদীয়তের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে চলেছে। এবং নিশ্চয় তা খৃষ্ট ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। এটি ঠিক করে বলা যায় না যে, ক্রুশ অথবা হেলাল'কে আফ্রিকা শাসন করবে।

(ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের খৃষ্টান অধ্যাপক S.G Willimson লিখিত Christ or Mohammad বই দ্রঃ)

(২) সারা বিশ্বে মানবমন্ডলীর উদ্দেশ্য জামাতে আহমদীয়ার সেবা অতুলনীয়।

(U.K সালানা জলসা-২০০০ উপলক্ষ্যে প্রেরিত বাণী- উইলিয়াম হেগ, পার্লামেন্ট সদস্য ও বিরোধীদলীয় নেতা)

(৩) এখানে ব্রিটেনেও আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমাদের সভ্যতা ও আমাদের সমাজকে নতুন শক্তি যোগানোর ক্ষেত্রে মহান সেবা উপস্থাপন করে যাচ্ছে।

(চার্লস কেনেডী-পার্লামেন্ট সদস্য, লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি, ব্রিটেন)

(৪) জামাতে আহমদীয়া আমাদের দেশে বিগত ৪৬ বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত আছে। আর শাখা-প্রশাখা সারা দেশে বিস্তৃত হয়ে আছে। এ সময়ে জামাত নিজ কর্ম দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, এরা একটি শান্তি-প্রিয়, সহযোগী, আইনানুগ, মার্জনাশীল এবং চিন্তাশীল ধর্মীয় জামাত।

(বেঞ্জামীন উইলিয়াম মাকাপা প্রেসিডেন্ট-তানজানিয়া)।

মসজিদ ঃ সারাবিশ্বে আট হাজারের মত মসজিদ জামাত নির্মাণ করেছে। সিডনী, কোপেনহেগেন, কানাডা, সিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, ফোর্টল্যান্ড, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ডেটন টেক্সাস, ফ্লোরিডা, হামবুর্গ, ফ্রাংকফুট, হেগ, নরওয়ে, ওসলো, সুইডেন, প্যারিস, সুইজারল্যান্ড পেট্রোয়াবাদ, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে জামাত মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে।

প্রকাশনা ঃ জামাত এ পর্যন্ত ৫৩টি ভাষায় কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আরও ১৪টি ভাষায় অনুবাদ শেষ হয়েছে, ১৮টি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে-৩টি ভাষায় অনুবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ৭৯টি পত্রিকা প্রকাশ করছে। শুধুমাত্র ২০০০ সালেই ১২ লক্ষ ১২ হাজার ৭শ' ৩৮টি বই বিতরণ করেছে। এবছর পৃথিবীর দশ ভাগের এক ভাগ লোকের কাছে বই পৌছানোর দায়িত্ব নিয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বর্তমানে পৃথিবীতে আর কোন সম্প্রদায় নেই যারা এ ধরনের সফল কোন প্রকাশনার দাবী করতে পারে।

হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ আফ্রিকাতে বহু (প্রায় ৪০টি) হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা) নির্মাণ করে জামাত সেবা করে যাচ্ছে। নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে এর কার্য পরিচালিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে নিম্নের মন্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য জ

(১) "সারা বিশ্বে এ জামাতের প্রশংসনীয় সেবাসমূহ বিশেষ করে মুজাহিদদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাছাড়া অন্যান্য প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্যের ব্যাপারে আপনাদের কর্মকান্ড প্রশংসার দাবী রাখে। কসোভো, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে আপনাদের সেচ্ছাসেবকদের নিঃস্বার্থ সেবাসমূহ সর্বস্বীকৃত ও অতুলনীয়"।

(বাণী UK. সালানা জলসা-২০০০ঃ চার্লস কেনেডী-পার্লামেন্ট সদস্য-ব্রিটেন)

(২) "আমার ইহা বলতে দ্বিধা নেই যে, আপনাদের জামাত মানবতাকে খোদাতাআলার ও এ বিশ্বের চিরস্থায়ী শান্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার এক পথ প্রদর্শক জামাত।

(বাণী UK. সালানা জলসা-২০০০ঃ তোমাসি পায়া, গর্ভনর জেনারেল-তুভালু)

(৩) তানজানিয়াকে আধ্যাত্মিকভাবে কল্যাণ পৌছানোর সাথে সাথে জামাতে আহমদীয়া আমাদের দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ন্যায় বিভাগগুলোতেও এমন উল্লেখযোগ্য সেবা সম্প্রদান করে যাচ্ছে যা আমাদের দেশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

(বাণী UK. সালানা জলসা-২০০০ঃ প্রেসিডেন্ট, তানজানিয়া)

(৪) আপনারা আমাদের দেশের সাথে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আমরা জানি, আপনাদের এ সহযোগিতা অন্যান্য এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যাবে।

(বাণী UK. সালানা জলসা-২০০০ ঃ সালীফ দেয়ালো-উপদেষ্টা প্রেসিডেন্ট বুরকিনা ফাঁসূ)

MTA ঃ জামাতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যে সব মাধ্যমগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে MTA (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল) অভূতপূর্ব। সেটেলাইটের মাধ্যমে প্রথম ১৯৯২ সালে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা প্রচার করা হয়। ৭ জানুয়ারী ১৯৯৪ সালে ১২ ঘন্টা অনুষ্ঠান দেখানো হয়। ১লা এপ্রিল, ১৯৯৬ সালে ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডায় ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯৬ এশিয়া এর অন্তর্ভুক্ত হয়। জুলাই মাসে ইহাকে সারা বিশ্বে সম্প্রসারণ করা হয়। ২০০০ সালে MTA তে ডিজিটাল প্রযুক্তি সংযোজিত হয়। ইতোমধ্যে ইহা ইউরোপ ও আমেরিকায় সার্ভিস দিচ্ছে। MTA তে ১২টি কেন্দ্রীয় বিভাগ পর্যায়ক্রমে কাজ করছে। তাছাড়া সারা বিশ্বে হাজার হাজার সেচ্ছাসেবক কর্মী এতে কাজ করে যাচ্ছে। এতে একটি ভিডিও ও আটটি অডিও চ্যানেল রয়েছে। ইহা খলীফার [হুযূর (আইঃ)-এর] খুতবা প্রচার, লেকামাল আরব, প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশন, উর্দূ শিক্ষার ক্লাস, শিশুদের ক্লাস, কুরআন-হাদীস প্রচার, বাংলা, ইন্দোনেশিয়ান, জার্মান, ফ্রেন্স, তুর্কি, আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ও বসনিয়ান ভাষায় কুরআন হাদীস-ভিত্তিক ধর্মীয়, রুচিশীল ও মার্জিত অনুষ্ঠান প্রচার করে সারা বিশ্বে সত্যিকার ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বে MTA -এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। নিম্নের উদ্ধৃতি হ'তেও বিষয় দু'টি স্পষ্ট হবেঃ

(১) "কাদিয়ানী চ্যানেলকে আমরা স্বাগত জানাই। তারা সে কাজ করেছে যা সারা বিশ্বের মুসলিম করতে পারে নি"

(TV সাক্ষাতকার-সৌদীর শাহযাদা খালেক)

ওয়াকফে নও ঃ বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও তা'লীম তরবিয়তি কার্যক্রমকে সফল ও সহজভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ৩রা এপ্রিল লন্ডনের ফযল মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হুযূর (আইঃ) "ওয়াককে নও" (নবউৎস্বর্গীকৃত) এর তাহরীক করেন। এর উদ্দেশ্য হলো নিবেদিত প্রাণ, ধর্মভীরু, সুসংগঠিত মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা। পিতামাতার জন্মের পূর্বেই তাদেরকে দান করে থাকেন। বর্তমানে তাদের সংখ্যা ২০ হাজার ৫শ' ১৫জন। এর মধ্যে ছেলে ১৪হাজার, ২শ' ৫৯জন এবং মেয়ে ৬ হাজার ২শ' ৫৬জন। উল্লেখ্য, এ সংখ্যা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। ওরা উর্দু, আরবী, ইংরেজী সহ অন্যান্য ভাষা শিখবে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, মোবাল্লেগ, গবেষক, বিজ্ঞানী হয়ে জামাতী তত্ত্বাবধানে আমরণ ইসলামে সেবা করে যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে শুধু মাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই আগত শতাব্দীর কথা চিন্তা ধর্মের সেবার জন্য এ ধরনের (মরিয়মী কুরবানী) কুরবানী করার সুযোগ পেয়েছে।

তাহরীকে জাদীদ ঃ ১৯৩৪ সালে আমাদের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন। এর জন্য তিনি সাতাশটি মোতালেবাত (দাবী) পেশ করে। এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন- "তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য সাময়িক নয়। ঐ সময় আসছে যখন আমাদেরকে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কর্মসূচী আমরা নিজেরা তৈরী করি নি বরং আমাদের কর্মসূচী আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রণয়ন করেছেন" (আল্ ফযল-৩-১২-১৯৩৫)।

আজ যে ১৭০টি দেশে আহমদীয়ত প্রসার লাভ করছে তা-এ স্কীমের অধীনেই হয়েছে। এ স্কীমের সর্বশেষ আদায় (২০০০ সাল) এসে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ্য পাউন্ডে। এর পুরো টাকা বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। জামাতে আহমদীয়া ছাড়া বহিঃ বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য এ ধরনের তাহরীক অন্য কোন জামাতের (দেশের/ ফির্কার) আছে বলে আমার জানা নেই।

ওয়াককে জাদীদ ঃ ২৭ শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ সনে আমাদের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) ওয়াককে জাদীদের তাহরীক করেন। এর উদ্দেশ্য হলো জামাতের অভ্যন্তরীণ তা'লীম ও তরবিয়ত দান করা। শুরুতে এটি উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮৭ সালে হুযূর (আইঃ) এ স্কীমকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। বর্তমানে (২০০০সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) ১৬০টি দেশ এ স্কীম এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর সর্বশেষ আদায় (৫/১/২০০১) ৪ লক্ষ ৮১ হাজার ৭শ' ৮২ পাউন্ড। এর পুরো টাকা জামাতের অভ্যন্তরীণ প্রচার, তা'লীম ও তরবিয়তের কাজে ব্যবহৃত হয়।

খেলাফত ঃ যে কোন জাতি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর কাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হ'লে তাদের মাঝে একতা থাকা প্রয়োজন। এ একতাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজন একজন নেতা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুপস্থিতে ইসলামের এ নেতাকে ইসলামী পরিভাষায় 'খলীফা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। খালীফার তত্ত্বাবধানেই (প্রাথমিক কালে) ইসলাম আরবের সীমানা ভেদ করে ছড়িয়ে পড়েছিল আফ্রিকা ইউরোপ ও এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকায়। কালের পরিক্রমায় একদিন যখন ইসলাম খেলাফত শূন্য হয়ে অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে ঘুরছিল ঠিক তেমনি এক সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এসে পৃথিবীতে [মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীমত] খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর (আঃ) অনুপস্থিতে (প্রাথমিক যুগের মত) তাঁর (আঃ) খলীফাগণই আহমদীয়ত তথা সত্যিকার ইসলামকে বিশ্বের ১৭০টি দেশে ছড়িয়ে নিয়ে গেছেন। শক্ত করে দিয়েছেন জামাতের ভীতকে। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন উপরে বর্ণিত বিভিন্ন স্কীমগুলো। বর্তমান বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছাড়া আর কারও মাঝে খেলাফত ব্যবস্থা নেই।

উপরে বর্ণিত জামাতে আহমদীয়ার সফলতা তাহরীকগুলোর উপস্থাপনের পর আমরা বলতে চাই- আজ থেকে একশ' বার বছর আগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) গন্ডগ্রাম কাদিয়ানে দাঁড়িয়ে, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যেসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করেছিলেন তা সত্য। ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে (আল্লাহ্‌র নির্দেশে) যে জামাত গঠন করেছিলেন তার গতি অপ্রতিরোধ্য একবিংশ শতাব্দী সে শতাব্দী যাতে আহমদীয়তের (সত্যিকার ইসলামের) বিশ্ব বিজয়ের মানচিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করব।

শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন

(তথ্য ঃ ইসলামী ইবাদত, পাক্ষিক আহমদী, আহ্বান, স্মরণিকা-কানাডা-৯৪, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, জুমুআর খুতবা হুযূর (আইঃ), U.K সালানা জলসা-২০০০)।

মূলধারা

নতুন সহস্রাব্দে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়, ফতোয়াবাজি নিষিদ্ধ ঘোষণা

যুগে যুগে ফতোয়ার কারণে মানবতা ও মানবিকতা হয়েছে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত, কুফুরী ফতোয়া ও মুরতাদ ফতোয়া হতে এ বাংলাদেশে রক্ষা পায় নি আমাদের সম্মানিত বুদ্ধিজীবিরাও। ফতোয়াবাজির শিকার হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা। রুদ্ধ হয়েছে প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী মানুষের কণ্ঠ। ইদানিং বাংলাদেশে ফতোয়াবাজির যেন জোয়ার চলছিল। কথায় কথায় ফতোয়া দেয়ার প্রবণতা ক্রমশ বেড়েই চলছে। ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদী কর্তৃক ফতোয়ার নৃশংসতা কি, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম ১৯৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রামে। তারা সে দিন আমাদের মা-বোনদেরকে গণিমতের মাল ফতোয়া দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার জল্লাদ বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। সে ফতোয়াবাজরা ৭১-এ ধর্মের নামে চালিয়েছিল নারকীয় হত্যাযজ্ঞ যার সাক্ষী হিসাবে আজ নতুন আবিষ্কৃত বধ্যভূমিসমূহ বর্তমান। এরা প্রত্যহ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উপায়ে ফতোয়াবাজির মাধ্যমে দেশে নিত্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর ফতোয়ার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে উস্কে দিয়ে উত্তেজিত করে দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে করে তোলে অশান্ত। যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিশেষ করে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। মোল্লাতন্ত্রের এ ফতোয়াবাজির বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার আগে ১ জানুয়ারী ২০০১ সালের হাইকোর্টের "ঐতিহাসিক রায়" ফতোয়াবাজি নিষিদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ করছি। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের অবকাশকালীন বিশেষ বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায়ে এখন থেকে দেশে সবধরণের ফতোয়াজারি অবৈধ, এই ধরনের ফতোয়া প্রদানকারীকে শাস্তি দেয়ার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে হাইকোর্ট জাতীয় সংসদকে পরামর্শ দিয়েছে। দেশের সকল মাদ্রাসা ও স্কুলে "মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ" পাঠ্যভুক্ত করতে সুপারিশ করেছে। মসজিদে মসজিদে শুক্রবারে জুমার নামাজের সময় খুতবা পাঠের পূর্বে এই অধ্যাদেশ আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও রায়ে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া মহামান্য আদালত দেশে একটি

দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়। এ রায়ে যদিও বা জুমার খুতবায় এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যারা প্রচলিত ব্যবস্থায় জুমার খুত্বা প্রদান করে তারা সকলে মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলভী, যারা প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদের প্রদত্ত খুত্বায় প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা চিন্তা করা প্রয়োজন। রায়ের পর্যালোচনায় হাইকোর্ট বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বা ধর্মীয়গোষ্ঠী গঠন করে কিভাবে এক শ্রেণীর লোক ভুল ধারণা নিয়ে মৌলবাদী হচ্ছে তার কারণ খুঁজে দেখা দরকার। তাদের শিক্ষায় ও চিন্তা-চেতনায় অবশ্যই ত্রুটি রয়েছে। এ বিষয়ে আদালত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করেছে। আইন শৃংখলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংবিধান অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা আদালত উল্লেখ করেন। রাষ্ট্র জনগণের নৈতিকতা সংজ্ঞায়িত ও বলবৎ করবে। সমাজকে করবে শিক্ষিত। আদালত হাজী আজিজুল হকের দেয়া ফতোয়াকে ভুল বলে ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নওগাঁর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দেশ দেয়। জাতীয় সংসদকে পরামর্শ দেয়া হয় ফতোয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত করার। নওগাঁর ফতোয়ার ঘটনা দেশে যেন পুনরায় না ঘটে সেজন্য দেশের সকল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে আদালত সতর্ক করে দেয়। এ ছিল মহামান্য আদালতের ঐতিহাসিক রায়।

যে বিষয়ের আলোকে আদালত রায়টি প্রদান করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেয়া প্রয়োজন মনে করি। নওগাঁ জেলার আটিখা গ্রামের সাহিদার স্বামী সাইফুল রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে তালাক উচ্চারণ করে। পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে তারা একত্রে বসবাস করে। এ ঘটনায় এলাকার হাজী আজিজুল হক সাহিদাকে হিল্লা বিয়ে দিয়ে পুনরায় স্বামীর সংগে বসবাস করার ফতোয়া জারি করেন এবং তা পালিত না হলে শাস্তির হুমকি দেন। এ বিষয়ে দেশের পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টির প্রতি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে হাইকোর্ট সেখানকার উক্ত ফতোয়াবাজ হাজী আজিজুল হককে সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সুয়োমটো রুল নিশি জারি করে। এর আলোকে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯ এ ফতোয়াবাজ আজিজুল হককে হাইকোর্টে হাজির করানো হয়। এ বিষয়ে শুনানীকালে ইন্টারভেনর হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ডঃ কামাল হোসেন। তাকে সহযোগিতা করেন এডভোকেট নিজামুল হক নাসিম, ডঃ ফষ্টিনা পেরেরা। আবেদনকারীর পক্ষে বক্তব্য রাখেন ব্যারিষ্টার আমীর-উল-ইসলাম, তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট মনজিল মুরশিদ ও ডঃ শীরিন শারমিন চৌধুরী, এমিকাস কিউরি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ব্যারিষ্টার তানিয়া আমির এবং সরকার পক্ষে ছিলেন ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

নতুন সহস্রাব্দের নতুন বছরের প্রারম্ভেই হাইকোর্টের এ ঐতিহাসিক রায়ে দেশের সুশীল সমাজ খুবই আনন্দিত। তারা একবাক্যে এই রায়কে অভিনন্দিত করেন এবং ফতোয়া-বাজদেরকে সত্যিকার অর্থে নির্মূল করতে ব্যবস্থা নেয়ার উপর জোর তাগিদ দেন। এ রায়ের কারণে আমার মতে গত বছরের আদালতের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে আদালতের প্রতি জনগণের যে অনাস্থাভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা কিছুটা হলেও দূরিভূত হতে পারে। এ রায়ের আলোকে আজ মনে পড়ে ফতোয়াবাজ মৌলবাদীগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ঘটে যাওয়া সেই নারকীয় ঘটনার কথা, এ নারকীয় নৃশংসতার ঘটনা সেদিন পত্র পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে, দেশের প্রগতিশীল সমাজ সোচ্চার হয়েছে ঠিকই, তবে তারা গঠনমূলকভাবে এগিয়ে আসেনি যার কারণে নিজ এলাকা হতে এক আইনজীবিকে জীবনের ভয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে। ফতোয়াবাজির শিকারে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬২ জন নারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দেশে অগণিত সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটেছে যার কিছু বিবরণ নিম্নে পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি। গত ৮ বছরে জনকণ্ঠ জরিপ অনুযায়ী ঃ ১৯৯৩-১৯৯৫ পর্যন্ত ফতোয়ার শিকার-৪৩ জন নারী। ১৯৯৬ সালে - ১২ জন। ১৯৯৭ সালে - ২৭ জন। ১৯৯৮ সালে - ৩০ জন। ১৯৯৯ সালে - ২৮ জন এবং ২০০০ সালে - ২২ জন।

এছাড়াও ১৯৯৩ সালে নূরজাহান নামে একজনকে ফরিদপুরে ফতোয়ার মাধ্যমে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়, '৯৪ সালে হাজেরাকে দেয়া হয় ৮০ ঘা দোররা, ৯৫ সালে বিষপানে জোহরা আত্মহত্যা করে ফতোয়ার কারণে, ৯৬ সালে জুলনূর খাতুনকে ১০০ ঘা দোররা মারা হয়, ৯৭ সালে মেহেরপুরের ফজিলাকে ফতোয়ার মাধ্যমে স্বামীগৃহ হতে বের করে দেয়া, ৯৮ তে মর্জিনা খাতুনকে একঘরে করে দেয়। ফতোয়াবাজরা ৯৯ সালে ফাতেমাকে সমাজচ্যুত করে। ২০০০ সালে হবিগঞ্জে সুহেনা খাতুনকে ফতোয়া দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ছিল শুধুমাত্র ফতোয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের নিরীহ মা-বোনদের কথা। এর আগে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে ফতোয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ২ লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোনের কথা সকলেই অবগত। ফতোয়াবাজদের কালো ফতোয়া হতে রেহাই পাননি ড. আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রহমান হতে শুরু করে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিরা পর্যন্ত। যখনি কোন বিষয় মৌলবাদীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করেছে তখনই তারা ফতোয়ার তলোয়ার নিয়ে হাজির হয়েছে। এছাড়াও ধর্মীয় জগতে ফতোয়াবাজদের কারণে মোল্লাগোষ্ঠী কর্তৃক যে অব্যবস্থা ও অরাজকতাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে তার সামান্য নমুনা পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি।

ফতোয়াবাজিতে সবচেয়ে বেশী অভ্যস্ত পাকিস্তানী মোল্লারা, যা ইদানিং আমাদের দেশে সংক্রমিত হয়েছে বেশী সংখ্যায়। পাকিস্তানে ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী কাদিয়ানী দাঙ্গা সম্বন্ধে মুরুব্বী শ্রেণীর সকলেই অবগত আছেন। যার কারণে মৌলানা মওদুদীকে মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়া হয়েছিল। এদের প্রেতাত্মা মজলিসে তাহফুজে খতমে নবুয়ত, পাকিস্তানের নায়েবে আমীর আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানী ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর দুবাইয়ের শুয়ুখ মসজিদে যে বক্তৃতা প্রদান করেন সে বক্তৃতাটি পাকিস্তানে যা "কাদিয়ানী আওর দুসরে কাফেরোঁ কে দারমিয়ান ফারাক" শীর্ষক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি সেই উর্দু পুস্তিকাটি এদেশের সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিকারী রাজাকার, আলবদর ও মৌলবাদী সংগঠনগুলো বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। পুস্তিকাটির বাংলা নাম রাখা হয়েছে "কাদিয়ানীরা কাফির এবং অন্যান্য কাফিরের সঙ্গে কাদিয়ানীদের পার্থক্য"। উক্ত পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে এদেশের উক্ত মৌলবাদী চক্র যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে এবং তাতে যে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ইন্ধন যোগাচ্ছে তা পরিষ্কার। আমি নিজে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে কক্সবাজার, টেকনাফসহ বিস্তীর্ণ এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখেছি। অসংখ্য মাদ্রাসা সৃষ্টি করেছে এবং সেখানে ছাত্রদেরকে সুশীল শান্তিময় প্রকৃত শিক্ষার বিপরীতে দেশে অরাজকতাময় পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সে সব স্থানে আধুনিক অস্ত্রের আমদানির খবরও মাঝে মধ্যে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এ সব কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করছে মায়ানমার শরণার্থী রোহিঙ্গারা যারা আমাদের জন্য বিষফোঁড়া হিসাবে বর্তমান।

এ পর্যায়ে আলেম সম্প্রদায়ের বিষয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়ার জরুরী। মহানবী (সাঃ) ধর্মে দুই প্রকার আলেমদের কথা উল্লেখ করেছেন। মহানবী

(সাঃ) এর ভাষায়, এক প্রকার আলেম হচ্ছে "আমার উম্মতের উলামা বনি ইসরাইল জাতির নবীদের সমতুল্য"। অন্য প্রকার আলেম হচ্ছে, "তাদের তথাকথিত উলামা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে, এদের মধ্যে থেকেই ফেতনা ছড়াবে আবার এদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে (মেশকাত, কিতাবুল ইলম)।"

মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা প্রকৃত খোদাভীরু ও রসুল প্রেমিক হাক্কানী আলেম যারা প্রথম শ্রেণীর আলেমদের অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে আমি সম্মান করি কিন্তু এ ধরনের আলেমদের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। অপরদিকে ২য় পর্যায়ের আলেমদের সংখ্যা বর্তমানে সবচেয়ে বেশী যার কারণে সেই তথাকথিত লেবাসধারী উলামারা ধর্মের নামে রাজনীতি-কুটনীতি করে, ধর্মের নামে ব্যবসা করে, বিভিন্ন ফতোয়া দিতে যেয়ে খোদার উপর খোদকারী করে, দেশে অরাজকতাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি সর্বদা এসব আলেমদের বিরুদ্ধে। কারণ প্রকৃত ধার্মিক কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না এবং তাদের কর্তৃক মানবতা ও মানবিকতা হুমকির কারণ হতে পারে না। এরা সর্বদা দেশের ও দশের কল্যাণার্থে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখেন। তাই প্রকৃত ধার্মিক হয়ে ফতোয়াবাজীর বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার আহবান জানিয়ে সেই তথাকথিত ফতোয়াবাজ উলামাদের প্রকৃত পরিচয় কি এবং তাদের ফতোয়ার কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগ ও মধ্যযুগ এবং বর্তমান সময়ে ইসলাম ও মানবতা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার কতিপয় উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। (ক) বেরলভী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেওবন্দীদের ফতোয়া ঃ যে ব্যক্তি আল্লা জাল্লা শানুহু ছাড়া অপর কাউকে আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত) বলে সাব্যস্ত করে আর আল্লাহর সমপর্যায়ে অন্য কারও জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করে সে নিঃসন্দেহে কাফের। তার ইমামতি, তার সাথে মেলামেশা, তার প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ সব হারাম।

(খ) ১. শিয়াদের বিরুদ্ধে দেওবন্দী আলেমদের ফতোয়া ঃ শিয়ারা কেবল মুরতাদ, কাফের আর ইসলাম বহির্ভূতই নয় বরং তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের এমন শত্রু যা অন্যান্য সম্প্রদায়ে কম পাওয়া যাবে। মুসলমানদের এ ধরণের লোকদের সাথে সব রকমের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত। বিশেষ করে বিয়ে শাদীর বিষয়ে।

২. বর্তমানকালের শিয়ারা রাফেযীরা সাধারণভাবেই ধর্মের আবশ্যক বিষয়াদি অস্বীকারকারী এবং সুনিশ্চিৎ মুরতাদ, তাদের পুরুষ বা নারীদের বিয়ে অন্য কারো সাথে হতেই পারে না।

(গ) আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সত্তরজন দেওবন্দী আলেম কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফতোয়া জারী করে তাতে আহলে হাদিস সম্প্রদায়কে তারা কাফের ফতোয়া দেন এবং বলেন যে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ এবং ধর্মের জন্য ফিতনা ও ভয়ের কারণ।

(ঘ) জামায়াতে ইসলামী ও এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ফতোয়া। (১) মওদুদী সাহেবের লেখা বই পুস্তকের উদ্ধৃতি দেখে প্রতীয়মান হয় তার ধ্যান ধারণা ইসলাম ধর্মের অর্থ নির্দেশক সমস্ত ইমাম এবং সম্মানীত সব নবীর শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা ও অবমাননায় ভরপুর। তিনি যে নিজে পথভ্রষ্ট ও অপরকে পথভ্রষ্টকারী এতে কোন সন্দেহ নেই। হুজুর আকরাম (সাঃ) বলেছেন, প্রকৃত দাজ্জালের আগমনের পূর্বে আরও ত্রিশজন দাজ্জাল জন্ম নেবে যারা আসল দাজ্জালের পথ সুগম করবে।

(২) জামিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রধান হযরত মৌলানা মুফতী মাহমুদ সাহেব মওদুদীর জীবদ্দশায় ঘোষণা করেন, "আমি আজ এখানে হায়দারাবাদস্থ প্রেস ক্লাবে ফতোয়া দিচ্ছি যে, "মওদুদী গোমরাহ কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত। তার এবং তার জামায়াতের সংগে সংশ্লিষ্ট কোনও মৌলভীর পেছনে নামায পড়া নাজায়েজ এবং হারাম।"

(৩) দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতোয়া ঃ "এই জামায়াত মুসলমানদের ধর্মের জন্য এদের পূর্বসুরীর (অর্থাৎ কাদিয়ানীদের) চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক। এছাড়াও ফতোয়াবাজদের কর্তৃক দেওবন্দী এবং তাদের সমমনাদের বিরুদ্ধে হারামাঈন, শরীফাঈন ও বেরেলভী আলেমদের ফতোয়া, দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ফতোয়া, চরমোনাই এর পীর সাহেব কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ফতোয়া এবং চরমোনাই ও দেওয়ানবাগীদের মধ্যে নিজেদের আধিপত্য ও ফতোয়ার লড়াই এখনো আমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর যা অতি সম্প্রতি সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে "দুই পীরের লড়াই নামক" একটি কলামও আমি লিখেছিলাম। এসব ফতোয়াবাজির কারণে বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও ধর্মপ্রাণ জনগণ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। যুগে যুগে বকধার্মিক আলেমরা এভাবেই ফতোয়ার তরবারি হাতে সাধারণ জনগণকে জিম্মি করে রেখে নিজেদের আধিপত্যকে বিস্তার করে রেখেছে। তাদের কারণে সর্বদা মানবতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সহমর্মিতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। বহির্বিশ্বে ইসলাম সন্ত্রাসবাদী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। নতুন সহস্রাব্দে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া জরুরী। নতুন বর্ষের প্রথম দিনে ফতোয়াবাজির বিষয়ে হাইকোর্টের এ ঐতিহাসিক রায় আমাদেরকে আশাবাদী করে তুলেছে। এদেশ অন্তত পক্ষে উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী এ ফতোয়াবাজির বিষাক্ত ছোবল হতে মুক্ত হতে পারবে।

সুধী পাঠক, ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই শান্তিপ্রিয় ও নিরাপত্তার প্রতীক, পাকিস্তানী মোল্লাচক্র ও তাদের এদেশীয় এজেন্ট কুখ্যাত রাজাকার, আলবদররা ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে এদেশকে আবার পাকিস্তান বানাতে চায়। তারা পাকিস্তানে যেভাবে নিয়মিত শিয়া-সুন্নী, মোহাজের-পাঠান আর সিপাহের সাহাবা ও রাফেযী এবং কাদিয়ানী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা, মারামারি ও খুন রক্তারক্তি লাগিয়ে রেখেছে সে পরিকল্পণার আলোকে তাদের টার্গেট হচ্ছে এবার বাংলাদেশ। যার বাস্তব প্রমাণ এসব ফতোয়াবাজি, বিভিন্ন মসজিদে বোমা হামলা, জাতীয় সংগীত বিতর্ক, দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ও কাফের ফতোয়া, হাইকোর্টের বিচারকদেরকে মুরতাদ ও কাফের ফতোয়া, প্রভৃতি। হাইকোর্টের এ ঐতিহাসিক রায়ের আলোকে বিনীত আবেদন, এদেশে সকল প্রকার ফতোয়াবাজী এবং সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিকারী, অন্য সম্প্রদায়কে কাফের ঘোষণামূলক ফতোয়াবাজী সকল বিষয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার আইন প্রণয়ন করে এদেশকে এবং প্রকৃত ইসলামকে রক্ষার আন্দোলনে শরীক হউন, যাতে তারা এদেশে পাকিস্তানী ষ্টাইলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে। আজ হাইকোর্টের এ ঐতিহাসিক রায়কে রাজাকার নিজামী এবং আমিনীর ন্যায় লোকেরা অবজ্ঞা করতে সাহস পায়। এদের এ দুঃসাহসের উৎস কোথায়? চিন্তা করার সময় এসেছে। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজু হয় সেখানে এসব সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিকারী '৭১ এর খুনী নরঘাতক রাজাকার আলবদরদের বিচার হয় না কেন? সকল মহলের প্রশ্ন। সুতরাং সকল মহলের প্রতি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান করছি, আজ শপথ নেয়ার সময়। শান্তির ধর্ম ইসলাম ও মহানবী (সঃ)-এর শিক্ষার আলোকে এসব নরঘাতকদেরকে প্রতিহত করে ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী সকল ধর্মের মতের লোকের সকল অধিকার নিশ্চিত করে ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষার আলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। সুতরাং বজ্রকণ্ঠে শপথ নেয়ার সময় এসেছে এখনই। নতুন শতাব্দীর দাবি রাজাকার, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ফতোয়াবাজমুক্ত বাংলাদেশ চাই।

নেছার আহমদ

[সৌজন্যে ঃ দৈনিক পূর্বকোন। চট্টগ্রাম। ১১ই জানুয়ারী-২০০১ইং]

যীশুখ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন

(আকাশে গমন ও পুনঃ আগমনের ধারণা)

খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে প্রচারিত হয়ে আসছে যে, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং শিষ্যদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের পরে ঊর্ধ্বে-স্বর্গে নীত হয়েছেন। মুসলমানরাও কথাটা বিশ্বাস করে, তবে অন্যভাবে। তারা বিশ্বাস করে যে, শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্ যীশুর পরিবর্তে অপর একজন (জুডাস)-কে রূপান্তরিত করেন কণ্ঠ ও চেহারায় অবিকল যীশুরূপে, তাকেই ইহুদীরা যীশু ভেবে ক্রুশে হত্যা করে। আর আল্লাহ্ যীশুকে তুলে নেন চতুর্থ আসমানে। কিছুকাল আগে দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক জনাব আব্দুল বাতেন সাপ্তাহিক রোববার, ১৮ আগষ্ট ১৯৯১ সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধে বলেনঃ "মুসলমানরা বিশ্বাস করে যীশুখ্রীষ্ট অথবা ঈসা নবী চতুর্থ আসমানে অথবা উচ্চভূমিতে লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস ও অন্যান্য সূত্র ভিন্ন কথা বলে। ঈশা নবী ইহুদী সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার শিষ্য সাগরেদ সবাই ছিলেন ইহুদী। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারণ করায় তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। ইহুদীদের সাবাহ্ অর্থাৎ পবিত্র দিন হলো শনিবার। তখনকার দিনে ইহুদীদের জন্য শনিবারে কোন কাজকর্ম লেনদেন ঝগড়া-বিবাদ করা নিষিদ্ধ ছিলো। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবার পর ক্রুশবিদ্ধ করে যীশুর মৃতুদন্ড কার্যকর করার আদেশ দেয়া হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ শনিবারে তার সাগরেদরা রোমান গভর্নরের অনুমতিক্রমে যীশুকে ক্রুশমুক্ত করে পূর্ব-নির্ধারিত কবরে নিয়ে যায় দাফন করার জন্যে। পাথর খুঁড়ে তৈরি কবরে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়। যীশুর প্রাণবায়ূ তখনো নিশ্চল হয়ে যায় নি। তৎকালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিলো। সাগরেদরা কবরের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সুস্থ হয়ে চারদিন পর তিনি কবর থেকে উত্থান করেন। তারপর তিনি অতি সংগোপনে ও সন্তর্পণে অন্যান্য শিষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শিষ্যদের সংগে আলাপচারিতার পর সাব্যস্ত হয় যে, যীশুকে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করতে হবে। যীশু তখন প্রশ্ন রেখেছিলেন আমি কোথায় যাবো? আমার বংশধরেরা সূদূর কোন্ দেশে আছে? শিষ্যরা তখন তাকে এই উপমহাদেশে পাড়ি দেবার পরামর্শ দেন। তারপর যীশু গভীর অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্ধান হন। মা ও অন্যান্য ভাইকে সংগে নিয়ে তিনি কাশ্মীরে উপস্থিত হন। কাশ্মীরে তিনি ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। শ্রীনগরে নাকি তাঁর কবর আজো বিদ্যমান। প্যালেস্টাইন থেকে কাশ্মীরে এসে পৌছতে তাঁকে চারটি রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে আসতে হয়েছে। পুরাতত্ত্ববিদদের মতে, এই চারটি রাষ্ট্র অতিক্রম করাকেই নাকি চতুর্থ আসমান বলা হয়ে থাকে।

যাহোক, যীশু যদি সবার চোখের সামনে নিদেন শিষ্যদের চোখের সামনেও স্বর্গারোহণ করতেন, তাহলে সে খবর দাবাগ্নির মত জেরুজালেমের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত এবং রোমান ও ইহুদী ঐতিহাসিকদের লেখাতেও তা লিপিবদ্ধ হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রোমান বা ইহুদী ঐতিহাসিকদের একজনও অমন প্রগাঢ় বিস্ময়কর ঘটনাটি সম্পর্কে একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি- সুসমাচার রচয়িতারাও তেমন কিছু উল্লেখ করেন নি- শুধু একটি দায়সারা খসড়া দিয়েই তারা কাজ শেষ করেছেন; তাছাড়া সে ঘটনা তারা চাক্ষুসও করেন নি। সুতরাং ব্যাপারটি খুবই গোলমেলে।

সুসমাচার রচয়িতাদের মধ্যে মথি ও যোহন যীশুর স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। শুধু মার্ক ও লুক মাত্র একটি বাক্যে অমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবৃতি শেষ করেছেন। মার্ক বলেছেনঃ শিষ্যদের সাথে কথা বলার পর প্রভু যীশু উর্ধ্বে স্বর্গে গৃহীত হলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসলেন (১৬ঃ১৯)। লুক বলছেন ঃ যীশু নিজে শিষ্যদের বৈথনিয়ার সম্মুখ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, তারপর তাদের আশীর্বাদ করতে করতেই তাদের থেকে পৃথক হলেন এবং উর্ধ্বে স্বর্গে নীত হলেন (২৪ঃ৫০-৫১)।

বাইবেলের ভাষ্যকার G.R. Duramelow তাঁর Commentary of Bible পুস্তকের ৭৬৯ পৃষ্ঠায় মার্কের স্বর্গারোহণ-মূলক ষোড়শ পরিচ্ছেদের ৯-১২ পদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ মার্কের এই অনুচ্ছেদটি প্রক্ষিপ্ত; বাইবেলের প্রধান প্রধান পাণ্ডুলিপি, যথা The codex vaticanus, গ্রীক ভাষার Codex Sinaiticus ও Sinatic Syriac-এ এই অনুচ্ছেদটি নেই। চতুর্থ শতাব্দীর Eusebins বলেন, আসল পাণ্ডু লিপিখানায় মার্ক ১৬ পরিচ্ছেদে অষ্টম পদেই তাঁর বর্ণনা শেষ করেছেন। সাধু যেরোমও এই বর্ণনার বিশ্বস্ততা সমর্থন করেছেন। সেই সময়কার গ্রীক পুরোহিত- Atbanasius, দু'জন Cyril ও Basil ও Gregony Naziangen প্রমুখ কেউই এই অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করেন নি। G.R Dummelow বলেন, "Internal evidence points definitely to the conclusion that the last twelve verses are not by st. Mark. For (1) the true conclusion certainly contained a Galilean appearence (Mark xvi. 7-8), and this does not. (2) The style is that of bare catalogue of facts, and Ouite unlike st. Mark usual wealth of graphic details. (3) The section contains numerous words and expressions never used by st. Mark. (4) Mark xvi, 9 makes an abrut fresh start and is not continuous with the preceeding narrative (5) Mary Magdalene is spoken of (xvi.9) as if she had not been mentioned before although she has just been attended to twice (xv. 47 xvi. 1), অর্থাৎ-অন্তর্নিহিত বিষয়-বস্তুর মারফত নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে, শেষের পদ বারটি সাধু মার্ক কর্তৃক লিখিত নয়। কারণ (১) মার্কের পূর্ব অনচ্ছেদে যীশুর গালীলে গমনের কথা রয়েছে (মার্ক ১৬ঃ৭-৮)। কিন্তু এ অংশে তার উল্লেখ নেই। (২) এ অংশের লিখবার ধরন মার্কের লিখবার ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা ঘটনার তালিকা মাত্র; মার্কের সমৃদ্ধ ও বিস্তারিত রচনাভঙ্গী এতে অনুপস্থিত। (৩) এ অংশে এমন বহু সংখ্যক শব্দ ও রচনাভঙ্গী রয়েছে যা সাধু মার্ক ইতঃপূর্বে কখনও ব্যবহার করেন নি। (৪) এ অংশের ১৬ঃ৯ অনুচ্ছেদটি শুরু হয়েছে যেমন সম্পূর্ণ হঠাৎ করে তেমনি সম্পূর্ণ নতুনরূপে। পূর্বের বর্ণনার সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। (৫) ১৬ঃ৯ অনুচ্ছেদে মগ্দলিনী মরিয়মের প্রসঙ্গ এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন পূর্বে কোথাও তার কথা উল্লেখ করা হয় নি। অথচ কিছু পূর্বের বর্ণনাতেই দু' দু'বার তার উল্লেখ রয়েছে (১৫ঃ৪৭;১৬ঃ১)।

Sir John William Bargon তাঁর Commentary- তে বলেন, "প্রাচীন কাল থেকে সাধু মার্কের সুমাচারের শেষ অধ্যায়ের অষ্টম পদের পরে "TEAOS" -(সমাপ্তি) লেখার রেওয়াজ রয়েছে।"

বস্তুত মার্কের শেষ অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ এবং মূল

পুস্তক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যাওয়ার কারণেই এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ইদানিং নতুন নিয়মের একটি ছিন্ন পাতা পাওয়া গেছে। পণ্ডিতগণ এটাকে মার্কের শেষ (ষোড়শ) অধ্যায়ের শেষাংশ বলে মনে করেন। এতে লেখা আছে, "অতঃপর এই ঘটনার পরে যীশু স্বয়ং পূর্বদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং এর দ্বারা তিনি পশ্চিম পর্যন্ত অনন্ত জীবনের পবিত্র বাণী ঘোষণা করলেন, আমেন"(Canon and Text of the New Testament, P-512) উল্লেখ যে, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত Revised Standard Version- এ আলোচ্য অনুচ্ছেদ, অর্থাৎ ৯ থেকে ২০ নম্বর পদ মুল বচন থেকে বাদ দিয়ে মার্জিনাল নোটে দেয়া হয়েছে। অনুমান করা হয় যে, মাত্র আটটি পদ দিয়ে কোন পরিচ্ছেদ হতে পারে না, তাই তাকে অসম্পূর্ণ মনে করে দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরষ্টন নামক জনৈক খ্রীষ্টান পণ্ডিত আরও বারটি পদ (৯-২০) যুক্ত করে তাতে যীশুর আকাশে গমন ও ঈশ্বরের ডান পাশে আসন গ্রহণের বিষয় বর্ণনা করেন (কনসাইজ বাইবেল কমেন্টারী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

লুক লিখিত যীশুর স্বর্গারোহণ-মূলক বর্ণনা প্রসঙ্গে G.R. Dummelow বলেন, "A few ancient authorities omit these words" অর্থাৎঃ প্রাচীন লেখকদের কতিপয় এ অংশের উল্লেখ করেন নি। Peaks'ও তাঁর Commentary of Bible- এর ৭৪২ পৃষ্ঠায় ওই বর্ণনা সমর্থন করেছেন। G.R. Dummelow আরও বলেন, "If the words and carried up in Heaven .... অর্থাৎ- শব্দগুলি এবং যদি স্বর্গে নীত হলেন অংশটি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে এ পদটির অর্থ হতে পারে যীশু অন্তর্ধান হয়ে গেলেন–স্বর্গারোহণ করেন নি (Commentary of the Bible, p-769)

যাহোক, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে, যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে সশরীরে স্বর্গারোহণ করেছেন, আর বিশ্বাসঘাতক যিহুদা ঈস্কারিয়োৎ অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে (মথি, ২৭ঃ৩-৫ দ্রষ্টব্য)।

পক্ষান্তরে, বার্নাবাসের সুসমাচারে বলা হয়েছে যে, যীশুকে গ্রেফতারের জন্য ইহুদী প্রধানরা যিহুদা ঈস্কারিয়োৎকে নিয়ে সেনাবাহিনী সমেত যখন যীশুর আবাসস্থলের নিকটবর্তী হয়, তখন বহু লোকের আগমন ধ্বনি শুনতে পেয়ে যীশু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বান্দার বিপদ দেখে তাঁর দূতবৃন্দ জিব্রাঈল, মিকাঈল, আজরাঈল ও ঈস্রাফিলকে হুকুম করলেন যীশুকে মর্ত্য থেকে আকাশে তুলে নিতে, সেমতে পবিত্র ফেরেশ্‌তারা আবির্ভূত হয়ে ঘরের দক্ষিণমুখী জানালা দিয়ে যীশুকে বের কেরে নিয়ে গেলেন তৃতীয় আসমানে, যেখানে ফেরেশ্‌তারা সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রশংসাধ্বনি গাওয়ায় নিমগ্ন রয়েছেন (১২৫ অধ্যায়)। এদিকে যীশুকে যে কামরা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে সেই কামরায় যিহুদা ঈস্কারিয়োৎ প্রবেশ করা মাত্র মহাকুদরতময় খোদা কুদরতের কাজটি এমনইভাবে সম্পন্ন করলেন যে, যিহুদা ঈস্কারিয়োৎ রূপান্তরিত হ'ল কণ্ঠ ও চেহারায় অবিকল যীশুরূপে (২১৬ অধায়)। আর যীশুরূপী সেই যিহুদাকেই ইহুদীরা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। Basilidan খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বিশ্বাসটি প্রচলিত আছে এবং মুসলমানদের মধ্যেও তা ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। সাধারণ মুসলমানরা বলে থাকে যে, হযরত ঈসা (আঃ) বা যীশুকে আল্লাহ্‌তাআলা জীবিতাবস্থায় সশরীরে আকাশে তুলে নিয়েছেন, শেষ যুগে তিনি পৃথিবীতে পুনঃ আগমন করবেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের এই বিশ্বাসের প্রতি বিজ্ঞ মুসলিম উলামা-পণ্ডিতদের কোন সমর্থন নেই। মক্কার রাবেতা আলমে ইসলামী (মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ)–এর পক্ষ থেকে বহু খ্যাতনামা উলামাদের অংশ গ্রহণে মাওলানা মোহাম্মদ আসাদ সাহেবের সম্পাদনায় ইংরেজীতে প্রকাশিত The Message of The Qur'an –এর ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে– ঈসাকে সশরীরে আকাশে উঠিয়া নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের এই বিশ্বাসের সমর্থন কুরআনে কোথায়ও পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু তারও কোন সনদ কুরআন বা সহি হাদীসে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মুফাস্‌সেররা যেসব গল্প লিখেছেন, তা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের এই ভাষ্য-গ্রন্থটি প্রথমে প্রথম নয়টি সূরা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। তারপর যে কোন কারণেই হোক এই মহৎ কর্মটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ পরিমার্জিত হয়ে মোহাম্মদ আসাদ সাহেবের স্বীয় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা শিরোনামে দার আল্–আন্দালুস লিমিটেড কর্তৃক ৩ লাইব্রেরী র‍্যাম্প, জিব্রাল্টার থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে। সংস্করণটির পরিবেশক EJ BRILL, 41 Museam Street, London, WCIAILX. এই সংস্করণে সূরা নিসার ১৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৭১ নং টীকায় বলা হয়েছে Thus the Quran categorically denieis story of Crucifixion of Jesus. There exist among Muslims, many fanciful legends telling us that at the last moment God substituted for Jesus a person closely resembling him (according to some account, that person was Judas), who was subsequently crucified in his place. However, none of these legends finds the slightest suport in the Qur'an, or in authentic traditions and the stories produced in this connection by the classical commentators must be summarily rejected. This represent no more than confused attempts at "harmonizing" the Qur'anic statement that Jesus was not crucified with the graphic description. In the Gospel is, of his crucifixion. The story of the crucifixion as such has been succinctly explained the Qur'anic phrase **wa-lakin shubbiha lahum**, which I render as "but it only appeared to them as if it had been so "implying that in the course of time, long after the time of Jesus, a legend had somehow grown up (possibly under the then– powerful influence of Mith raistic beliefs) to the effect that he had died on the cross in order to atone for the "Original sin" with which mankind is allegedly burdened; and this legend became so firmly established among the latter-day followers of Jesus that even his enemies, the Jews, began to believe it – albeit in a derogatory Sense (for cruafixion was, in those times a heinous form of death–penelty reserved for the lowest of criminals). This, to my mind, is the only satisfactory explanation of the phrase **Walakin Shubbiha lahum Khayyila** li [a thing] became a fancied image to me: i.e. "in my mind"–in other words." (it seemed to me." (See Qamus art khayala, as well as Lane II, 833, and IV, 1500). *(চলবে)*

গ্রন্থনা ॥ আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৭৭তম সালানা জলসা ২০০১-এর শুভ উদ্বোধন

৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৩ দিনব্যাপী ৭৭তম সালানা জলসা দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও ভাবগাম্ভীর্য ধর্মীয় পরিবেশে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে ন্যাশনাল আমীর বলেন, পবিত্র ইসলামে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি নেই। মানুষকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার কোন বিধানও নেই। তেমনি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কোন প্রকার অশালীন মন্তব্যের জন্যও কোন মানুষ কাউকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে না। এ প্রসঙ্গে তিনি ফতোয়াবাজীর কুফল সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করেন এবং এর ফলে যাতে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন না হয় সে জন্য সচেষ্ট হতে সকলের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানান।

তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ধৈর্য, মানবতার সেবা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তাবায়নে দোয়া ও কঠোর সাধনা করতে অনুরোধ করেন।

এ জলসায় দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান যোগদান করেন।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
আহ্বায়ক, মিডিয়া সাব-কমিটি
৭৭তম ন্যাশনাল সালানা জলসা-২০০১

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়ার ৫৮তম সালানা জলসা-২০০১ সুসম্পন্ন

মহান আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ার ৫৮তম সালানা জলসা অভূতপূর্ব সফলতার সাথে গত ১৯ ও ২০শে জানুয়ারী, ২০০১ইং রোজ শুক্র ও শনিবার তারুয়ায় মসজিদে বাশারত প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

১৯শে জানুয়ারী রোজ শুক্রবার জুমুআর নামাযের পর।

কাযা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। জনাব মারুফ আহমদ ও জনাব ইবরায়েতুল হাসান যথাক্রমে সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন ও নযম পাঠ করেন। অতঃপর ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী উদ্বোধনী ভাষণ দেন ও দোয়া করান। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াঁজী, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া। হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন ও খ্রীষ্টীয় তৃতীয় সহস্রাব্দের শুভযাত্রা, খাতামান্নাবীঈন (সঃ)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ্‌, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মাওলানা সালেহ আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব আবদুল ওয়াহিদ।

২০শে জানুয়ারী সকাল ৯.৩০ মিনিট স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জহির আহমদ মিয়াঁজী সাহেবের সভাপতিত্বে ২য় অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন ওয়াকিল আহমদ সুমন ও ওয়াকার আহমদ জুয়েল। এরপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন, ইসলামী খেলাফত ও ইতায়াতে নেযাম, মালী কুরবানী ও নেযামে ওসীয়্যত, আমি কেন আহমদী হলাম এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌলবী হাফেয সেকান্দর আলী, মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, জনাব এ কে রেজাউল করীম, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু সাহেদ। মাঝে সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীরের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২.৪৫ মিনিটে। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব ওয়াকার আহমদ জুয়েল, জনাব এস, এম হাবিবুল্লাহ্‌। উক্ত অনুষ্ঠানে নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ, আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব-কর্তব্য ও দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌ এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মৌলনা সালেহ আহমদ, জনাব তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২। এরপর নযম পাঠ করেন জনাব ইবরায়েতুল হাসান। যাদের ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টায় জলসা সফলতা লাভ করেছিল তাদের শুকরিয়া আদায় করেন এবং দোয়ার এলান করেন। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দেন ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ১৮টি জামাত থেকে আগত এই জলসায় মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৭০০ জন মহিলা সহ ১৮৫৯ জন।

সেক্রেটারী
সালানা জলসা কমিটি-২০০১

৭৭তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে আমীর, যুক্তরাজ্য জামাতে'র বাণী

❑ Thank you for your very kind invitation dated 14th January 2001 to attend the 77th Jalsa Salana of Ahamadiyya Muslim Jama'at Bangladesh due to be held in Dhaka from 9th February, 2001.

I regret that owing to the short time available to make travel arrangements, it would not be possible for me to attend this Jalsa.

Please accept our very best wishes for the success of your Jalsa. Allah shower His choicest blessings on those who participate in it. May you all witness the acceptance of the prayers of the promised Messiah, Amin.

Please convey the salaam of all members of UK Jamaat to the participants and request them to pray for the attainment of the objectives that the UK Jama'at has set itself for this year.

Iftikhar Ayaz
AMIR UK

তেবাড়িয়া লাজনা পরিদর্শন

আল্লাহ্‌তআলার অপার অনুগ্রহে গত ২২শে ডিসেম্বর ২০০০ইং তারিখে খাকসারার তেবাড়িয়া লাজনা ইমাইল্লাহ্ পরিদর্শনের সুযোগ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। লাজনা বোনদের উপস্থিতি ছিল ২৭ জন লাজনা ও ৫ জন নাসেরাত।

তেবাড়িয়া লাজনার আমেলার সংগে পরিচিত হই। তাদের উদ্দেশ্যে বলি - "আপনারা অতি ভাগ্যবতী কেননা, আল্লাহ্‌তাআলার কৃপা দৃষ্টি আপনাদের উপরে পড়েছে। এ কারণে এখানে মোখালেফাত হয়েছে এবং মোখালেফাতের কারণে তেবাড়িয়া জামাতে নব জাগরণ সূচীত হয়েছে। মোখালেফাত আসে ঈমানের পরীক্ষা নিতে। এর মাধ্যমে সংঘটিত হয় জামাতের সম্প্রসারণ ও ব্যাপক পরিচিতি। বোনদের এখন হুযূর (আইঃ)-এর তাহরীক মোতাবেক বেশী বেশী তবলীগ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে একতা ও সংহতি বজায় রেখে আহমদীয়তের শিক্ষা ও আদর্শকে বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক বোনকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তৌফীক দান করুন, আমীন।

২৮শে ডিসেম্বর ২০০০ইং তারিখেও পুনরায় সেখানে ঈদের নামায পড়তে যাই। ঈদ উপলক্ষ্যে মসজিদ প্রাঙ্গণ সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল।

– মাকসুদা রহমান, সদর
বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্

জাতীয় পত্রিকা সমূহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৭৬তম সালানা জলসা ২০০০-এর প্রকাশিত খবরা-খবরের অংশ বিশেষ

খুলনা বিভাগীয় তৃতীয় বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলন-২০০১ইং সফলতার সাথে সম্পন্ন

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযল ও রহমতে খুলনা বিভাগীয় তৃতীয় বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলন-২০০১ইং গত ৪ ও ৫ই জানুয়ারী ২০০১ইং বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেবের উপস্থিতিতে স্থানীয় আমীর ও বিভাগীয় ওয়াকফে নও এর সেক্রেটারী জনাব জি, এম আতিয়ার রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন জামাতের মসজিদ বায়তুস্ সালামে অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জামাত থেকে ২৭ জন ওয়াকেফীনে নও ও ৪২ জন মাতা-পিতা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচীর মধ্যে ছিল লিখিত পরীক্ষা, কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, কুইজ ও খেলাধূলা প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

এহতেশামুল বশির আহমদ,
ওয়াকফে নও সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

খুলনা রিজিওনের ৩য় ওয়াকফে নও সম্মেলনের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের দৃশ্য

মাহিগঞ্জ জামাতে ২০০১ সাল উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেব

শোক সংবাদ

গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, পুনিয়াউট (ব্রাহ্মনবাড়ীয়া) গ্রামের অধিবাসী বাবুল আহমদ চৌধুরীর মাতা জনাবা উমেদা খাতুন, স্বামী মরহুম রেজা আহমদ চৌধুরী বিগত ১৩ জানুয়ারী / ২০০১ শনিবার প্রাতঃকালে বার্দ্ধক্যজনিত রোগে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিয়ুন)। তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক ৮৫ বৎসর। মরহুমা একপুত্র দুই মেয়ে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য ভ্রাতা-ভগ্নীগণের কাছে দোয়া প্রার্থী।

শেখ আবদুল আলী, যয়ীমে আলা
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বি.বাড়ীয়া

❑ কাফুরিয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ভারপ্রাপ্ত কায়েদ জনাব মোহাম্মদ রুহুল আলম গত ৮.১.২০০১ তারিখে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে বাসের হেল্পার হিসেবে নিজ কর্তব্য পালনকালে ছাদ থেকে পড়ে যান এবং ৯.১.২০০১ রাত প্রায় ১১টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ২৫ বছর। অত্যন্ত মিষ্টভাষী, নেক প্রকৃতির এ ভাই বছর দেড়েক আগে বয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং কাফুরিয়া মজলিসে তাঁর শূন্যতা পূরণের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন রইল।

আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক, রিজিওনাল কায়েদ
রাজশাহী রিজিওন

❑ গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ক্রোড়া জামাতের বাসুদেব নিবাসী মোসাঃ সুফিয়া খাতুন, স্বামী মোঃ খলিলুর রহমান ভূঁইয়া (সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া জামাত) গত ৪-০১-২০০১ইং রোজ বৃহস্পতিবার বেলা আনুমানিক ১২.১৫ মিঃ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৬৫ বছর। তিনি তাঁর স্বামী,ছয় ছেলে, তিন মেয়ে এবং নাতি-নাতনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

- মোঃ লুৎফুর রহমান

❑ চট্টগ্রাম জামাতের প্রবীণ আহমদী সদস্যা মিসেস জেরিনা বেগম গত ১৭ই জানুয়ারী, ২০০১ সকাল ১০টায় জামাল খান সড়কস্থ নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে .... রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মরহুমা জেরিনা বেগম প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সদালাপী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ৬ পুত্র, ৬ কন্যা ৭০ জন পৌত্র-প্রপৌত্র, বহু আত্মীয়-পরিজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর স্বামী জনাব সৈয়দ খাজা আহমদ চট্টগ্রাম জামাতের একজন প্রবীণ আহমদী।

আল্লাহ্‌তাআলা মরহুমাকে জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করুন।

লেঃ জাফর আহমদ, চট্টগ্রাম

❑ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের মৌড়াইল হালকার বিশিষ্ট প্রবীণ আহমদী জনাব আব্দুল ওয়াহেদ খন্দকার সাহেব দীর্ঘদীন বার্ধক্যজনিত রোগে শয্যাশায়ী থেকে প্রায় আশি উর্ধ্ব বয়সে গত ২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা ১১টায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। মরহুম জামাতের একজন অক্লান্ত কর্মী ছিলেন ও নিষ্ঠাবান আহমদী। জামাতের খেদমত করার জন্য তিনি 'দরবেশ' উপাধি লাভ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ৩ কন্যা অনেক নাতী-নাতনী এবং বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা যেন মরহুমের রূহের মাগফেরাত এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাবরে জামিল দান করেন সে জন্য জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন রাখছি।

- সালাহউদ্দিন আহমদ
কায়েদ, যেহানাত ও সেহ্‌তে জিসমানী
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

❑ আমার পিতা জনাব মোঃ ইউনুস আলী মৃধা ২৮শে রমযান ১৪২১ হিজরী, ২৫/১২/২০০০ইং ডিসেম্বর রাত ৪.৩০ মিঃ সময় নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। পারিবারিক কবর স্থানে মরহুমের দেখানো স্থানে তাঁকে কবর দেয়া হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। উল্লেখ্য, তিনি ৯৯ সনের আগষ্ট মাসে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হন।

- মোহাম্মদ আলী মৃধা
খুলনা জামাত

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION

36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG

TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own.

with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

গিনি বিসাউ রিপাবলিকে'র প্রেসিডেন্ট-এর বিশেষ প্রতিনিধি মাননীয় ধর্ম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রী ইব্রাহিম সুরী জালু উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন

ঘানার সম্মানিত অতিথি তিজানী ফের্কার নেতা ওস্তাদ মোহাম্মদ ইবনুস সা'আদ খলিফা ভাষন দিচ্ছেন

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)- এর তবারুক প্রাপ্ত বেনীন-এর বাদশাহ্ আযীগনা তয়ে পডেগবে (AJIGLA TOYI KPODEGBE) এবং চাহ্পগোই আডকো বিয়ো আলীদৌ (CHAPGUI ADKOU BIO ALIDOU)- কে মাওলানা আতাউল মজিব রাশেদ সাহেবের সাথে দেখা যাচ্ছে।

জলসা গাহের বর্হির্দৃশ্যের একাংশ

জামালপুর আঞ্চলিক তবীলিগী সভায় বক্তব্য রাখছেন মাওলানা সালেহ্ আহমদ

দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের নব নির্মিত ভবনের একাংশ

New Vol. No. 63 ❑ 14th & 15th Issue February 15, 2001 ❑ Tk. 15.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

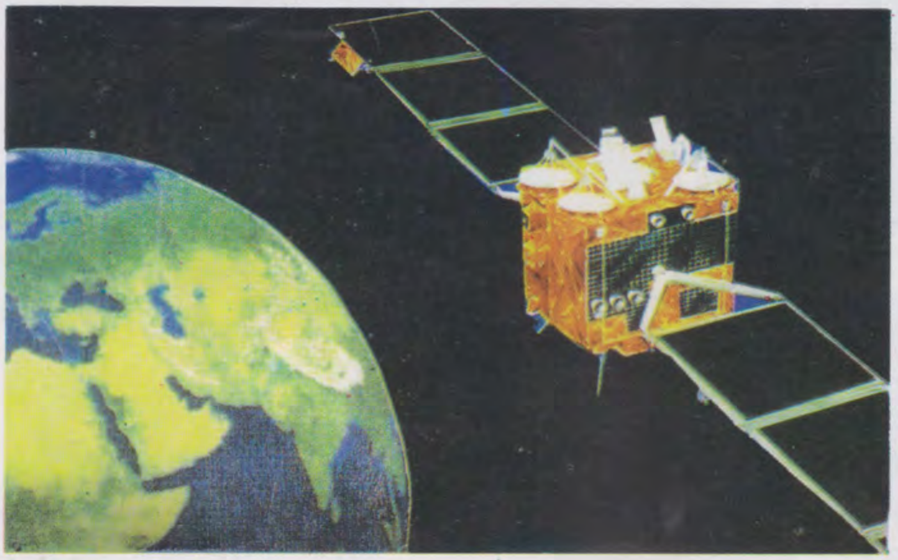

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহাটস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272